াদব্রজে পেশোয়ার যাত্রী

শ্রীপরাগরঞ্জন দে

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৩৯

দেড় টাকা

প্রকাশক
শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি
১৪।১ বি ভুবনমোহন সরকার লেন,
কলিকাতা

প্রিন্টার
শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ
নিউ সরস্বতী প্রেস
২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

শ্রীযুক্তপরাগরঞ্জন দে
ঢাকা হইতে কলিকাতা হইয়া
পদব্রজে প্রায় আঠার শত মাইল
পথ অতিক্রম করিয়া
পেশোয়ারে
গিয়াছিলেন।
ইঁহার স্বলিখিত বিবরণ
বাঁশরী পত্রিকাতে ধারাবাহিক রূপে
প্রকাশিত হইয়াছিল।
অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও
কৌতূহলোদ্দীপক
মনোজ্ঞ রচনা বিধায়
আমরা পুনরায় পুস্তকাকারে
প্রকাশ করিয়া
পাঠকবর্গকে পাঠের
সুযোগ করিয়া দিলাম।

১। অপরাধের জের—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ২৲
২। মুখোমুখি—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ২৲
৩। সমাজ-বীর—শ্রীমন্মথনাথ রায় বি-এল ১৸০
৪। নিশিরডাক—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ২৲
৫। বিনোদ-হালদার—(নূতন উপন্যাস) ঐ ২৲
৬। শূন্যতার প্রেম—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ২৲
৭। বন্ধুর দান—শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲
৮। সংসার-পথের-যাত্রী--শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ২৲
৯। শুভা ঐ ২৲
১০। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ২সং (সচিত্র) শ্রীসুধাকৃষ্ণবাগচি ২॥০
১১। বন্ধুর বিয়ে—শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ১॥০
১২। দর্পচূর্ণ—২য় সংস্করণ শ্রীমতীবনলতা দেবী ১॥০
১৩। রত্ন-মন্দির—২য় সংস্করণ শ্রীমতীবনলতা দেবী ১॥০
১৪। অপরাধী—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১॥০
১৫। মানরক্ষা—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৲
১৬। ভবঘুরে—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৷০
১৭। কর্ম্মভোগ—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৲
১৮। ডিক্রীজারি—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১॥০
১৯। নবাব—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ২॥০
২০। রসকলি—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ২৲
২১। ভোরের পূরবী—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ১৷০
২২। সুচরিতা—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ১॥০
২৩। মুক্তিস্নান—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৲
২৪। দোটানা—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২॥০
২৫। মনীষা—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া ২৲
২৬। অভিনেত্রীর একরাত্রি—ঐ ২৲
২৭। গৃহলক্ষ্মী—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৸০
২৮। লণ্ডন-কাহিনী—২য় সং শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি ২৲
২৯। পুণ্যের জয়—৪র্থ সং শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি ১৲
৩০। লক্ষ্মীশ্রী—৪র্থ সং শ্রীবনলতা দেবী ২৲
৩১। দিগন্ত—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১৸০

পদব্রজে
পেশোয়ার যাত্রী

১

কি জানি কি এক খেয়াল চাপলো—পায়ে হেঁটে পেশোয়ার পর্য্যন্ত যাবো—তার আগে ভাবনা চিন্তা কিছুই করলাম না। চিরকালই ভাববার আগেই কাজ করে বসি।

বন্ধুদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে সব ঠিক্ করে ফেললাম।

একথা মাকে বল্‌তে আর সাহস হ'লো না—তিনি যে যেতে দেবেন না এটা আমি খুব ভাল করেই জান্‌তাম। কাজেই কাকেও কিছু না বলে চুপি চুপি বাড়ী থেকে সরে পড়লাম—২রা ডিসেম্বর ১৯২৩, খুব ভোর রাতে, তখনও ঢাকার পথে লোক চলাচল আরম্ভ হয়নি।

সঙ্গে নিলাম একটী কাপড়, সার্ট ও একটী কম্বল আর ২।৪ খানি বই।

মেডিকেল স্কুলঘাট বুড়ীগঙ্গা নদী পার হয়ে কেরাণীগঞ্জ, তুলসীখালি, দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লাম। ঢাকা থেকে ফরিদপুর যাবার কোনও পথ নেই। মাঠের উপর দিয়ে, ক্ষেতের ঘাস মাড়িয়ে, নদীরধার বেয়ে কোনও মতে পথ চিনে চলতে লাগলাম। অবশ্য আগে থেকেই ম্যাপ দেখে সেগুলি ঠিক করে নিয়েছিলাম।

পথ পেতে কষ্ট হ'লো ধলেশ্বরীর চরে, কাণামাছি খেলায়

চোর' যেমন লাট্টুর মতন ঘুরপাক খায় আমার দশা ঠিক্ তাই হয়েছিল। তারপর চরের চাষাদের সঙ্গে চেঁচামেচি করে রাস্তা পেয়ে বাঁচি।

ধলেশ্বরী নদী পার হবার পর থেকেই আমার সাথী হলেন একজন মোল্লা সাহেব; তার কাছে খোদা মহম্মদ্ আর কোরাণের মাহাত্ম্য শুনতে শুনতে গালিমপুরে পৌছলাম। মোল্লা সাহেবের বাড়ী গালিমপুরেই—মধ্যাহ্নের আহার বেলা তিনটায় সমাপন করলাম তাঁর বাড়ীতেই। বেলা আছে দেখে আরও চলতে লাগলাম।

হিসেব করে দেখলাম চলা হয়েছে ২২ মাইল পথ। রাত্রে পা খুব ব্যথা করতে আরম্ভ কর্‌লো, স্বপ্ন দেখলাম ভারি মজার—পায়ের হাড়ে মাংসে ভয়ানক ঝগড়া ঝাটি বেধে গেছে—পায়ের মাংসগুলি সব একজোট হয়ে হাড় ক'খানাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। অস্থির অস্তিত্ব লোপে মাংসের রাজত্ব স্থাপন হ'লো—আমার ভারি ভাবনা হ'লো, তাইতো হাঁটবো কেমন ক'রে! জেগে দেখি সব ঠিক আছে, ভরসা হলো; তখন প্রায় ফরসা হয়ে এসেছে।

এবার পদ্মানদীর পারে যেতে হবে। মৌনট ষ্টিমার ষ্টেশন পদ্মার পারে। এখানে এসে, পদ্মার ঘাটে স্নান করে ফেল্‌লাম। সাড়ে বার আনা পয়সার দক্ষিণায় পরপারে মানে ফরিদপুরে

পৌছলাম। এখানে পেলাম College Boardingএর আতিথেয়তা। খাওয়া-দাওয়ার পর শোবার বন্দোবস্ত—একটী সিট (Seat) ছিল খালি—বিছানাটী ছিল মনিবের অভাবে নীরব। দখল করতেই খাটখানা খট্ খট্ করে উঠ্‌লো—আমিও চট্ করে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম।

খুব ভোরে উঠে ফরিদপুর যশোর রোড দিয়ে চল্‌তে লাগলাম—রাস্তাটী ডিষ্ট্রীক বোর্ডের। কিছুদূর গিয়ে জগবন্ধু মহাউদ্ধারণ ঠাকুরের মঠ দেখতে পেলাম। মঠের সাধুরা উষা কীর্ত্তন করছিলেন, শুনতে ভারি মিঠে লাগলো।

সহর থেকে ২ মাইল পথ বেশ সুন্দর—তারপর ডিষ্ট্রীক বোর্ড নিজ মুর্ত্তি বিকশিত ক'রেছেন। কাদা জল, ফাটা ভাঙ্গা, ধূলায় রাস্তাটী বড় কাহিল হয়ে পড়েছে। আবার মাঝে মাঝে বাঁশের পুল—একটু পা ফস্‌কালেই তাপিত তনু খালের জলে শান্ত হবার সম্ভাবনা।

রাস্তার ধারে এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি কার জন্য ভোট খরিদ করছি। আমার উত্তর না শুনে তিনি গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন "আমি সব বুঝি।"

আচ্ছা আপনি বুঝতে থাকুন আর আমি চলতে থাকি। সন্ধ্যে বেলা মধুমতী তীরে নদেরচাঁদ ঘাটে উপস্থিত হ'লাম। নদেরচাঁদ ঘাট সম্বন্ধে বেশ একটী গল্প আছে। নদেরচাঁদ

ছিলেন মস্ত একজন ফকির। কামরূপ কামাক্ষায় তিনি যাদু অভ্যাস করেন। যাদুর গুণ এমনি ছিল যে তিনি যাহা ইচ্ছা করতেন তাই হ'তে পারতেন। একদিন তাঁর স্ত্রী তাঁকে কুমীর হতে বলেন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর তা হ'তে তিনি স্বীকার করেন এবং কুমীররূপ ধরবার আগে একঘটী জল মন্ত্রপূত ক'রে বল্‌লেন যে তিনি কুমীরে পরিণত হ'লে যেন তাঁর দেহে এই জল সিঞ্চন করা হয়। কিন্তু তিনি কুমীর হবার পর সবাই ভয়ে পালিয়ে যায়। নদেরচাঁদও বেগতিক দেখে মধুমতীতে বাস করতে লাগলেন। সেখানে চাল কলা যথেষ্টই পেতেন। এখন হল কি—কয়েকজন পশ্চিমালোক এসে তাঁকে মেরে ফেলে। তাঁর এই অদ্ভুত ব্যাপার স্মরণ রাখবার জন্য এ জায়গাটীর নামকরণ হল—নদেরচাঁদ ঘাট। এখানকার লোকে এই কাহিনীটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে এমন আজব করে তোলে যে বিদেশী লোককে চমক্ লাগিয়ে দেয়। ওখান হোতে পূবে চ'লে আসলাম—তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। মধুমতীর প্রথম অংশ হেঁটেই পার হ'লাম—জল ছিল প্রায় এক বুক! উঃ কি ভয়ানক ঠাণ্ডা! অপর অংশ খেয়াতে পার হয়ে মহম্মদপুরে পৌছিলাম। এখানে পুলিশ ষ্টেশনে গিয়ে উঠ্‌লাম। মহম্মদপুর সীতারাম রায়ের রাজধানী ছিল। রাজবাড়ী সমস্তটাই জঙ্গলে ঢাকা, অল্প অল্প ভয়ও আছে। অনেকগুলি পুকুর এবং গড়ে

স্থানটীকে ম্যালেরিয়ার জীবন্ত Power house করে তুলেছে যেহেতু পুকুর আর গড়ের জল ভয়ানক ভাবে খারাপ। সব চেয়ে বড় পুকুরটী দৈর্ঘ্যে আধ মাইল আর পাশে ৫০০ হাত—এসব দেখ তে শুন্‌তে বেলা ১২টা বেজে গেল। বাজার হতে চিড়া গুড় কিনে পকেট বোঝাই করলাম—এবং তার সৎকার করতে করতে চলতে লাগলাম। পল্‌তে খেয়া ঘাটে নবগঙ্গা নদী পার হ'লাম। প্রায় এক রকম মাঠের উপর দিয়ে পথ। দু'পাশে আমন ধানের ক্ষেত। ফসল তেমন সুবিধার দেখলাম না।

২

মাঠের রাখাল ছেলেরা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতো "কণে যাচ্ছো"? প্রশ্নটীর জবাব পে'লে ভারী খুসী হ'তো। "এপথে যাও ডানে যেও না—বাঁয়ে যাও" এসব বলে মুরুব্বীয়ানা চালও ছাড়তো।

ধুনোগাথি চিত্রানদীর উপর। বেশ একটী ছোট্ট বাজার। খেজুর সস্তা দেখ্‌লাম—কিছু কিনে নিলাম। বেদানা, কুইনাইন, হরেক রকমের পেটেণ্ট ওযুধ ইত্যাদির বেসাতি যশোরের দোকানের বিশেষত্ব।

অবশেষে বাঁশবনের তলা দিয়ে আমগাছের পাশ দিয়ে শালিকা থানায় আশ্রয় গ্রহণ করলাম।

৬ই ডিসেম্বর ১৯২৩

এবার রাস্তায় খুব ধূলো, পথে একটী ছোট জঙ্গলও পড়ে। যশোর, ভৈরব নদের পারে। "ভৈরব" নাম শুনে যতটা তর্জ্জন গর্জ্জন মনে করেছিলাম—তার অনুমাত্র না দেখে বড় ক্ষুণ্ণ হ'লাম।

যশোরে এসে স্কুল বোর্ডিংএর ছেলেদের সঙ্গে গল্পে স্বল্পে আহারে আমোদে কাটান গেল।

যশোর হ'তে কলিকাতা যাবার রাস্তাটার নাম Calcutta

Jessore Trunk Road, কলিকাতা হ'তে যশোরের ব্যবধান ৭৫ মাইল।

৭ই ডিসেম্বর ১৯২৩

এ রাস্তাটী প্রথমে যিনি তৈয়ার করেন তাঁর নাম কালি পোদ্দার। রাস্তাটা তৈরীর একটু ইতিহাস আছে। একদিন কালি পোদ্দার তাঁর মাকে নিয়ে গঙ্গা নাইতে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাঁর মা বল্লেন "আমি জমিদারের মেয়ে আর জমিদারের মা—অপরের জমির ওপর দিয়ে আমি চল্‌তে পারবো না।" একথা শুনে কালিপোদ্দার জমি কিনে রাস্তা বাঁধিয়ে দিলেন—যশোর থেকে কল্‌কাতা পর্য্যন্ত।

মাইল দশেক চলে ঝিকারগাছায় এলাম—ঝিকারগাছা কপোতাক্ষী নদীর তীরে। জল ভারী পরিষ্কার—নদীর ওপর সুন্দর একটী লোহার ঝুলান পুল আছে। এটী একটি খুব ভাল বাজার—সকল রকম সুবিধাই এখানে আছে। ২৩ মাইল পথ হেঁটে থামলাম বেনাপোলে হরিভক্ত হরিদাসের তুলসীমঞ্চ দেখ্‌তে।

বেনাপোল ও ঝিকারগাছায় যত সব আধমরা গরুর হাট। এ সব হাট থেকে গরু খরিদ করে ঠেঙ্গাতে ঠেঙ্গাতে কলকাতায় হাজির করা হয়। সেখানে কসাইদের হাতে জবাইয়ের জন্য সঁপে দিয়ে বেশ দু'পয়সা মুনাফা করে মুসলমান গরু-ব্যবসায়ীরা।

যশোর হতে ২৮ মাইল পরে বনগ্রাম। এখানে ধন্বামতী নদী পার হতে হয় floating Bridgeএ।

পুলটীর শেষের দু'দিক খুব উঁচু এবং ক্রমশঃ ঢালু হয়ে মাঝখানে মিশে গেছে। পুলটী তেমন বেশী চওড়া নয়। বনগ্রামের Captain S. N. Chakraverty M. B. মহাশয় ভোজন ও শয়নের ব্যবস্থা করে দিলেন।

গোবরডাঙ্গা, দত্তপুকুর, হাবড়া ছাড়িয়ে ক্রমাগত ৩৬ মাইল পথ অতিক্রম ক'রলাম। রাস্তায় একটী ছোট নদী পার হ'লাম—তার নাম যমুনা। রাত্রি প্রায় ৮॥০টার সময় বারাসাত পৌঁছিলাম। এখানে Govt. High School Boardingএর ছেলেদের ঘরে গেলাম। Superintendent কেমন যেন রোখা রোখা কথা বললেন—আমি তা নীরবে হজম ক'রলাম। আমাকে বড় বিনীত দেখে একখানি খালি চৌকিতে রাত পোহাবার হুকুম দিলেন। শীতের হাওয়া বড় ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলল। যেন তেন প্রকারেণ রাত কাটিয়ে সরে পড়লাম।

৮ই ডিসেম্বর ১৯২৩

মোট ১১ মাইল পথ আজকে হাঁটলাম। দম্‌দমার ভিতর দিয়ে ঘুঘুডাঙ্গা ডাইনে রেখে কাশি ক্রসিংএ পৌঁছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

যশোর জিলা ম্যালেরিয়ার একটী প্রদর্শনী। চব্বিশ পরগণাও

কম নয়। এ জায়গার লোকগুলি কি চমৎকার দেখ্‌তে, হাড় ক'খানার উপর কাল চামড়ার যেন একটা প্রলেপ। যতগুলি নদী পার হ'লাম সবগুলিই মরা, কচুরি পানাতে নদীবক্ষ চিরসবুজ। জলের কষ্ট কি ভয়ানক! শুকনো ডোবায় যা এক আধ ফোঁটা জল থাকে, নারকেলের খোলা কিম্বা বাটী দিয়ে তুলে কলসী ভরতে হয়। সুজলাং সুফলাং বাংলাদেশে কিনা এমনি জলাভাব! এ ধারণা আমার আগে ছিল না।

এ হেন যশোর, চব্বিশ পরগণায় একদিন থাকায় বোধ হয় কিছু পুণ্যও হয়েছিল। তা না হ'লে কল্‌কাতা পৌঁছবামাত্র কাঁপিয়ে জ্বর আসবে কেন? জ্বর ছাড়লো দশ দিন পরে—আর যেই একটু ভালো হ'লুম—অম্‌নি পেশোয়ার যাবার বন্দোবস্ত ঠিক্‌ ক'রতে লাগ্‌লাম। কল্‌কাতার Cycle Tourist club এর মেম্বারগণ বেশ উৎসাহিত ক'র্‌লেন—আর অনেক গুলি পরিচয় পত্র দিলেন—বল্‌তে গেলে বড় বড় সহরে লাইন ক্লিয়ার ক'রে তাঁরাই দিয়েছিলেন।

২০শে ডিসেম্বর ১৯২৩

আমার শরীর তখনও খুব খারাপ, অনেকে যেতে বারণ করেছিলেন আমি কিন্তু তাতে কাণ না দিয়ে বেলা ১১ টার সময় কলিকাতা হ'তে যাত্রা করলাম। হাওড়ার পুল পার

হয়ে চল্‌তে লাগ্‌লাম সিধে G, T, Road ধরে। এবার আর কোনও মতেই পথ ভোলা হবে না—পথই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। বালি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, পার হয়ে গেলাম। দু'ধারে পাটকল, চটকল, কাপড়ের কল। মহেশে বঙ্গলক্ষ্মী মিলটী দেখবার খুব সখ ছিল—কিন্তু এ অভাগার ভাগ্যে ঘটে উঠ্‌লো না। মহেশের রাস্তাটী খুব চওড়া, এখানকার রথযাত্রা খুব প্রসিদ্ধ—অনেকদিন পর্য্যন্ত মেলা এবং উৎসব থাকে—রথটানা হয় এই রাস্তার উপরই। সময় সময় ফ্যাক্টরীর ফেরৎ মাতাল মজুর আমার পথের পথিক হ'লো। সন্ধ্যে ৭½টার সময় চন্দননগরের সীমা রেখাতে পা পড়লো। ঘুরতে ঘুরতে নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দিরে প্রবেশ করলাম। এটি একটি লাইব্রেরী। এখানে অনেক ভদ্রলোকের কাছে আমার কাহিনী উদ্গীরণ করলাম। তাদের মধ্যে একতা বেশ। একজন ভদ্রলোক যেই বল্‌লেন "আমার বাড়ীতে যায়গা হবে না" ওম্নি অন্যান্য ভদ্রলোকেরা সেই সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠলেন "আমাদের বাড়ীতেও স্থানের অভাব।" যা হোক্ তাঁরা বাজারের খাবার খাওয়ালেন—আর শুতে দিলেন মেজেতে সতরঞ্চি বিছিয়ে। মোটের উপর ঘুম মন্দ হয়নি।

সকালবেলা এক কাপ চার সঙ্গে ঘুগ্‌নিদানা দিয়ে জলযোগ ক'রে চল্‌তে লাগলাম। রাস্তাটী সপ্তগ্রামের পরেই বাণিজ্যের

বড় সহর ছিল—এখন সেই সপ্তগ্রামে মাত্র কয়েক ঘর কুমারের বাস। এর খুব কাছেই সরস্বতী নদী পার হ'তে হয়। একদিন সরস্বতী নদীতে পর্ত্তুগীজদের জাহাজ চল্‌তো কিন্তু এখন নদীটির এ কাহিল অবস্থা দেখ্‌লে সেই সরস্বতী নদী ব'লে ত বিশ্বাসই হয় না। মগরাতে এসে একটা চালকলের বাবুদের রান্নাভাতের উপর বখ্‌রা বসান গেল। খেতে বসে বাবুরা আমার ওপর বিদ্রূপবাক্য বর্ষণে আমোদ উপভোগ করছিলেন। আমি পূর্ব্ববঙ্গীয়, কাজে কাজেই আমার চাল-চলন নাকি সবই দোষণীয়। আমি কিন্তু কিছুই বল্‌লাম না—এতে যদি তাঁদের অজীর্ণরোগ আক্রান্ত পাকস্থলীর পক্ষে হজম করবার সুবিধা ঘটে ত ক্ষতি কি।

২৫ মাইল পর সিমলা গড়ে এলাম। এখানে গেলাম জমিদার বাড়ীতে। শুন্‌লাম জমিদার মহাশয় হাওয়া বদ্‌লাতে কোন জায়গায় যেন গেছেন। তা যা হোক গোমস্তা মহাশয়ের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলাম। গোমস্তা মশায় আসলেন বটে কিন্তু কিছুতেই থাকতে দিতে রাজী নন—পরে আমার স্তব স্তুতিতে বিগলিত হয়ে একখানা খড়ের ঘরে থাক্‌বার অনুমতি দিলেন। ঘরখানা বাড়ীর একধারে; বাড়ীখানার অবস্থা বড়ই শোচনীয়। রাত্রে শীতের ঠেলায় চাল হতে খড়

টেনে জ্বালাতে লাগলাম, ভাবলাম খড়গুলি থাকলে নষ্ট হবে বই তো না!

সকাল বেলা খুব জোরে চলতে লাগলাম। কলকাতা থেকে ৫৭ মাইল দূরে মেমারিতে থামলাম। খাবারের দোকানে গিয়ে উদরের আগুণ নিভালাম। এখান হতে বর্দ্ধমান ১৫ মাইল ও রসুলপুর ৫ মাইল। রসুলপুর হতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। সন্ধ্যার সময় এলাম বর্দ্ধমানে—এখানে উকিল শ্রীহরি মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করলাম এবং একদিন বিশ্রাম নিলাম। নিজের কাপড় জামা কেচে নিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলাম। যেখানেই ২।১ দিন বিশ্রাম করিতাম সেইখানেই সেইরূপ কাপড় জামা পরিষ্কার করে নিতাম। বর্দ্ধমানে কাঞ্চননগরের ছুরি কাঁচি আর সেরসার ও কুতুবউদ্দিনের কবর দেখবার মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে।

বর্দ্ধমান থেকে বেরিয়ে গালসি থানার দারোগা বাবুর বাসায় কিছু জল খেলাম। রাস্তার দু'ধারে তত গাছ নেই—পথে শুধু জল আর ধূলো। সেদিন সন্ধ্যার সময় ৩৩ মাইলের পর কাঁকসা থানার ফজলাক হক্ সাহেবের অতিথি হ'লাম; এখানে একটী পুরাণো শিবমন্দির আছে একটী পুকুর পাড়ে—শিব ঠাকুরটীর নাম কঙ্কেশ্বর। পুকুরটী হিন্দুদের খুব পবিত্র ছিল—মুসলমানরা গোরক্ত মিশিয়ে নাকি অপবিত্র করে দিয়েছে।

রাস্তার দু'ধারে ছোট ছোট ঝোপ। ফরিদপুর গ্রামের আগে একটী পাঁচ মাইল দীর্ঘ জঙ্গল পার হ'তে হয়। শিকারীরা বুনো শুকর মারতে প্রায়ই এখানে এসে থাকে। ফরিদপুর পার হলেই জঙ্গল খতম হ'লো—সন্ধ্যে বেলা আমি অণ্ডাল থানার সত্যবাবুর সঙ্গে ভাব করে রাত্রের মতন আস্তানা গাড়লাম সেখানে।

সকাল বেলা অনেক সঙ্গী পেলাম কয়লা খাদের কুলি। সবাই ব্যস্ত সমস্ত। অণ্ডাল থেকে রাণীগঞ্জ যেতে লাগলো প্রায় ১॥০ ঘন্টা। এতক্ষণ রাস্তার রং ছিল লাল, রাণীগঞ্জ থেকে হয়ে গেল কাল। বেলা ২টার সময় আসানসোলে এলাম। এখানে অনিল বসু মহাশয়ের আদর যত্নের কোনও অংশে ক্রটি পেলাম না।

আসানসোল থেকে উচু আর নীচু রাস্তা আরম্ভ হল। বৈকালবেলা কুলটীতে উপস্থিত হ'লাম—কুলটীতে সেই সময় কুলিদের ধর্ম্মঘট চলছিল। স্বামী বিশ্বানন্দও সেই সময় সেখানে ছিলেন। ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে আলোচনা করাই সে সময়কার বিশেষ কাজের জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কুলটীতে ঢুকতেই এক সাহেব হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমার কুলটীতে আসার মতলব কি? আমি আমাদের কলেজ হতে আনা পরিচয় পত্রখানা তাঁকে দেখিয়ে দিলাম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কাহাকে চাও!"

আমি উত্তর দিলাম "ডাঃ রায়কে" ডাক্তারবাবুর বাড়ীটী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে তিনি দেখিয়ে দিলেন। আমি ডাঃ অতুল রায় মহাশয়ের নিকট আশ্রয় প্রার্থী হলাম। তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন।

এখান থেকে বরাকর ১॥০ মাইল দূরে—বরাকর নদীর পুলটাও ভারি চমৎকার। নদীর অপর পারে চারিটী শিব মন্দির। দুটী বড় দুটি ছোট। বড় দুইটীই বেশী পুরাতন; দু'দিকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়লার খাদ। এখানকার লোকরা বাংলা বলে সাঁওতালি সুরে—রাস্তাও যথেষ্ট উঁচু নীচু—গাছ তো খুব কমই আছে।

ক্ষুদিয়া নদীর পারে বারোয়া গ্রাম। এখানে মণীন্দ্র বাবু একলা থাকেন। তাঁর বাড়ীতে খুব অসময়েই গিয়েছিলাম—কিন্তু খুব তৃপ্তির সহিত আহার করালেন। বাড়ীতে ঘি দুধ, খামারের ধান চাল সবই আছে—তাঁর কথায় জান্‌তে পারলাম, আগে তিনি ঢাকায় ২৫৲ টাকা বেতনে কাজ করিতেন—কিন্তু তাতে তাঁর চল্‌তো না। চাক্‌রি ছেড়ে দিয়ে এখানে আসেন কত কষ্ট কত দুঃখ বরণ করে নিয়ে—আজকে বেশ ক্ষেত খামার করে সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। সেদিন Calcutta University Institute এ বক্তৃতা হয়ে গেছে যে বেকার সমস্যা মীমাংসা করা হবে তোপ চাঁচিতে শিক্ষিত যুবকদের দিয়ে চাষবাস করিয়ে! কিন্তু চাষেতে যে কি মজা মণিবাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেই বুঝা যায়।

(৩)

সন্ধ্যে বেলায় গোবিন্দপুরের থানায় আশ্রয় নিলাম। কি করব সেখানকার বাঙ্গালীরা যখন পথিক বাঙ্গালীকে আশ্রয় দিতে নারাজ তখন বাধ্য হয়ে সরে পড়তে হলো।

এখান থেকে ২২ মাইল দূরে তোপচাঁচি। আশেপাশের চাষের জমিগুলোরও ধরণ ধারণ ক্রমেই আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে, রাস্তাটা উঁচু আর নীচু—জায়গায় জায়গায় চল্‌লো ত চল্‌লই এক মাইল উৎরাই তারপর আবার আধ মাইল চড়াই—তার ধারে ধারে শাল মহুয়ার ছোট ছোট ঘন বন। একটি সাঁওতাল যুবক গোবিন্দপুর থেকে আমার সঙ্গী হলো। সে খুব মজার মানুষ—প্রাণে তার আনন্দ যেন খেলে বেড়াচ্ছে—বাঁশী বাজানো আর গান করাই ছিল পথে তার কাজ—তোপচাঁচিতে এসে তাকে ছেড়ে দিতে খুব কষ্ট হলো!

তোপচাঁচি জায়গাটা পাহাড়ের কোলে। বাংলো, বাজার, ডাকঘর, ডাক্তারখানা সবই আছে। এখানকার সরকারী ডাক্তার মহাশয় যে রকম যত্ন করলেন, তা এই ১৯০ মাইলের ভিতর কোথাও পাইনি। প্রধান কারণ ডাক্তার মহাশয় উড়িষ্যাবাসী আর আমি পূর্ব্ববঙ্গীয়, কি জানি একটা কথা আছে যাতে এ দু'দেশের লোকের সামঞ্জস্যতা স্বীকার করে—তারজন্যই বোধ

হয়, তিনি আমার স্থবিধার জন্য এতটা কষ্ট স্বীকার করেছিলেন। এখান থেকে এক মাইল দূরে একটী ছোট পাহাড়িয়া নদীর জল বেঁধে ফেলা হয়েছে। এ নদীর জল আশেপাশের Coal district এ ভাল জলের বন্দোবস্তের জন্য এই water worksএর সৃষ্টি।

পরেশনাথ পাহাড়ের জৈন মন্দিরগুলি খুব স্থন্দর দেখ্তে—যেন কাল দৈত্যের মাথায় রূপোর মুকুট। লোভ আর সাম্লাতে না পেরে পরেশনাথের মন্দির দেখতে গেলাম—ঘুরে ঘুরে উপরে উঠ্লাম। এ পাহাড় থেকে কতকগুলি ছোট বড় ঝরণা বয়ে যাচ্ছে—একটাতে স্নানও কর্লাম। মন্দিরের একটি লোক আমার খাবার বন্দোবস্ত করে দিতে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন—কিন্তু আমার সময় কম ছিল বলে তাঁকে কষ্ট দিতে আমার প্রবৃত্তি ছিল না। যাবার সময় তিনি ছাতু আর গুড় সঙ্গে দিয়েছিলেন। এর জন্য তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আমি আবার পথে ফিরলাম। অনেকক্ষণ রেলের লাইনের দেখা পাইনি। হঠাৎ ডুমরির কাছে দেখা। এ ত আমার দেশের লোক—এ লাইনটীকে পেয়ে কত আপনার জন বলে মনে হল। ডুমরী হতেই হাজারীবাগের বন স্থরু হয়েছে। খুব জোরে চল্‌তে লাগলাম—যদি অস্থানে সন্ধ্যে হয় তবেই ত বাঘের হাতে পড়তে হবে।

পদব্রজে পেশোয়ার যাত্রী

সন্ধ্যের সময় বগোদার পৌঁছলাম—জোরে হাঁটার পর বড় ক্ষিদে পেয়েছিল—একটা দোকানে বসে গেলাম ও কিছু খাবারও উদরস্থ হলো। তারপর দোকানের পেছনে দেখলাম—পাঁচ ছয়জন লোক গোল করে বসে আছে আর মাঝখানে আগুন জল্‌ছে। দোকানীকে জিজ্ঞেস করে জান্‌লাম, তারা ধানবাদ গিয়াছিল চাকুরীর চেষ্টায় কিন্তু কিছু ত করতে পারেইনি উপরন্তু লাভের মধ্যে হয়েছে—পুঁজিপাটা যা কিছু ছিল, সবই গেছে তাই তারা তাদের দেশে অর্থাৎ গয়ায় ফিরে যাচ্ছে। একলা চল্‌তে কেমন লাগে, তা যিনি চলেন তিনিই জানেন। এদের যদি গয়া পর্য্যন্ত পাওয়া যায় তবে মন্দ কি? তাদের সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করলাম—প্রথমটা ত ক্রিশ্চান ঠাওরিয়ে কথাই বল্লে না কারণ আমার পরণে হাপ্‌-প্যাণ্ট ছিল বলে—তারপর যখন রামের গুণাবলী ও মহাবীরের মহা কাণ্ডের কথা আওড়াতে আরম্ভ করলাম তখন তারা হিন্দু বলে স্বীকার করলে। পরে তারাই পথের বন্ধু হয়েছিল।

সে রাত্রিতে দোকানঘরে তাদের সঙ্গে জুটে গেলাম। আগুনের উপর চাপাটি সেকৃছিল—দুখানা আমাকে খেতেও দিলে। তারপর কম্বলখানা মুড়ি দিয়ে খড়ের উপর শুয়ে পড়লাম। আগুনে ঘরখানা মন্দ গরম হয়ে উঠেনি।

পরদিন এদের সঙ্গ নিলাম। আমি সব সময়ে মাঝে

থাকতে চেষ্টা করতাম—কেন না যদি বাঘ এসে পড়ে তবে পাশের কাউকে নিয়ে যাবে—সত্যি কথা বলতে কি আমার একটু একটু ভয়ও লেগেছিল বাঘের সম্বন্ধে ভয়ানক ভয়ানক গল্প শুনে। তারা তেলে ভিজিয়ে নরম করা নাগরা জুতা জোড়াটি লাঠির মাথায় টাঙ্গিয়ে আর বোঁচকা বুঁচকি পিঠে ফেলে চল্‌ল।

ববাকাক্তা খুব কাছেই; সেখানে গরমজলের দু'চারটী ফোয়ারা আছে. লোকে তাকে বলে সূর্য্যকুণ্ড। এ জলে অনেক রকম চর্ম্মরোগ ভাল হয়। চলতে চলতে একজন সঙ্গী পেলাম। সাঁওতাল যুবক, সঙ্গে তার দুটা কুকুর আর (কারবাঁশ) তীর ধনুক। সে শিয়াল শিকার করবার একটী ফিকির বল্‌লে। যদি শিয়াল শিকার করবার দরকার হয় তবে সন্ধ্যের সময় বনে গিয়ে শিয়ালের মতন ডাকৃতে হয় তাই শুনে অন্য শিয়ালেও ডেকে উঠবে। সে ২।১ বার শিয়ালের মতন ডাক ডেকে আমাকে শোনালে। ২৫০ মাইল পাথরের কাছে আবার বরাকর নদী পার হলাম।

বারহিতে সময় মত পৌঁছলাম। এখানেও আগেকার মতন দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করলাম—আমি আমার বিহারী বন্ধুদের আজ খুব খাওয়ালাম—অবশ্য ছাতু আর গুড়—তাতে খরচ মোট ।৶১৫ পয়সা।

চোরপারণ পার হয়ে আবার সমতল ভূমিতে আসলাম। চোরপারণ মানে চোরের গেট। হাজারীবাগের অসভ্যরা গয়া প্রভৃতি জিলায় লুটপাট করতো—ফিরে আসতো এই গেট দিয়েই। পারণ অর্থাৎ তোরণ, এর থেকে নাম হ'ল—চোরপারণ।

ছোট ছোট কয়েকখানি মাত্র কুটীর নিয়ে একটী গ্রাম। মাঝে ২।৪ খানা গ্রাম ঝোপের আড়াল হতে উঁকি মারে। এক রকম বল্‌তে গেলে চোরপারণেই বন শেষ হয়ে যায়। ২৬৯ মাইলের কাছে মোহানা নদী পার হ'লাম সুন্দর পুলের উপর দিয়ে, আর নিলাজান (নীলজল) পার হলাম causeway এর উপর দিয়ে। নিলাজানের (২৮৩) উপর কোনও পুল নাই। বর্ষায় এত বেশী স্রোত হয় যে পুলটুকু কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেরঘাটি পর্য্যন্ত ঝোপ, ঝাড় পড়ে। রাস্তার ধারে ছোট ছোট কুলগাছ, কুলগুলি পেকে লাল হয়ে আছে। সন্ধ্যে বেলা ধোবিতে আবার একটী দোকান ঘরে আড্ডা গাড়লাম।

ধোবি হতে গয়া ২০ মাইল উত্তরে। গয়া আমাদের মহা পুণ্যের স্থান। বিনা কাজে ভ্রমণ করা পাপ বিশেষ। এ হেন পাপ যদি গয়া পর্য্যটনে খণ্ডন করা যায় তবে তা করবো না কেন? ধোবি হতে গয়া যাবার রাস্তাটা বেশ। গয়ার

কাছাকাছি গিয়ে আমার সঙ্গীগণ সরে পড়লেন—আমি পুনর্মূষিকের ন্যায় একলা গয়াতে আসলাম।

গয়ায় প্রথমে যে বাঙ্গালীর কাছে গেলাম তিনি K. T. Friend & Co নামক ওষুধের দোকানের মালিক। তিনি যেন বাঙ্গালীই নন—দ্বিতীয় বাঙ্গালী মহাশয় মৌখিক আপ্যায়িত করেই বিদায় দিলেন।

তারপর বিরক্ত হয়ে বাঙ্গালীদের রাজেন্দ্র পাঠাগারে গেলাম; সেখানে অনেকগুলির সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল এবং রাত্রি ৮টার সময় পূর্ণচন্দ্র ঘোষ উকিল মহাশয়ের বাড়ীতে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হল।

রাত্রে বুদ্ধগয়া যাবার সঙ্কল্প করলাম।

বুদ্ধগয়া গয়া হতে ৬ মাইল দূরে। প্রায় ৩ মাইল শোন নদীর ধার দিয়ে চলে গিয়েছে—রাস্তায় যথেষ্ট ধুলো। ৪ মাইল পথ চলার পর হঠাৎ কেঁপে জ্বর এল—মাঠের উপর রোদে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম—কাঁপুনি যখন থামল, আবার চলতে আরম্ভ করলাম। মাথা ঝিম ঝিম ক'রতে লাগ্‌লো, পা চলতে আর চায় না—যেন গাঁটে হাজার বছরের মরচে পড়েছে।

আবার শুয়ে পড়লাম। ঘণ্টা দুই পরে আর ততটা লাগল না। অতি কষ্টে বুদ্ধগয়াতে দেহখানিকে টেনে হাজির করলাম।

সুরেশবাবু একখানি খাটিয়া দিলেন, বুদ্ধ গয়াতে দারোগা বালিশ আর একখানি কম্বল পাঠিয়ে দিলেন। জ্বর ৩ দিন ছিল। ডাঃ মেধা ৬০।৭০ গ্রেণ কুইনেন খাইয়ে চাঙ্গা করে তোলেন।

পা ফেটে একেবারে চেলা কাঠ হয়েছিল, জ্বর থেকে ভাল হয়ে দেখি, এসব আপদ দূর হয়েছে—পা ফাটা অনেক সেরে গেছে—ফোস্কাগুলি শুকিয়ে গেছে। এখান থেকে দক্ষিণে যাবো। সেরঘাটিতে—রাস্তার আশেপাশে ছোট ছোট কুলগাছ। কুলগুলি পেকে লাল হয়ে রয়েছে—পকেটে বুদ্ধিমানের মত নুন আর লঙ্কা নিয়েছিলাম—কুলের স্বাদ গ্রহণ করলাম—কুলগুলি আস্বাদে একটু তিতো হলো বলে তেমন সুবিধা হলো না—চারিদিকেই ঝোপঝাড়—এখান হতে ক্রমশঃ নীচুর দিকে চল্‌লাম।

জায়গাটী দুটি নদীর মাঝখানে—জয়ন্তী হতে পনেরো ফিট নীচে সেরঘাটি। এখানে ডাঃ যোগেশ্বর ব্যানার্জ্জির নিকট ছিলাম—আশেপাশের গ্রামগুলিতে অনেক গালার factory আছে। রাস্তার দোকানে পেঁয়াজী তিলকুট, তিলৈড়ি এবং আটা গুড়ের খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়—তাছাড়া ছাতু, লঙ্কা, নুন ত পাওয়া যায়ই। নদীর উপর বেশ পুল আছে—শীতকালে ও গ্রীষ্মকালের কিছুদিন খুব অল্প জল থাকে, কিন্তু আবার বর্ষার

সময় কাণায় কাণায় ভরে ওঠে। এখান হতে আউরেঙ্গাবাদ বাইশ মাইল দূরে। রাস্তার দুধারে গাছগুলি সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সত্য কিন্তু ছায়া দানে অক্ষম। আউরেঙ্গাবাদ গয়া জেলার একটী মহকুমা—ছোট একটী সহর; মোটের উপর সবই এক রকম পাওয়া যায়। এখানে ডাক্তার স্থরেশ ব্যানার্জ্জি মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলাম।

আউরেঙ্গাবাদ হতে ডিহিরি আঠারো মাইল। আউরেঙ্গাবাদের কাছেই একটা শুকনো নদীর উপর পারাপারের রাস্তা। এ রাস্তাটী বেশ ভাল। কাছেই একটী লোকের বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লাম। বাড়ীর কর্ত্তার নাম ছিল অর্জ্জুনসিং। তাঁর কাছে গিয়ে বল্‌লাম "আপনার নাম অনেক দূর হতে শুনে আসছি, আপনি অতিথি পরায়ণ তাই আপনার কাছে আসলাম।" —তিনি আমার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে ছাতু গুড় বক্‌শিস দিলেন। তাড়াতাড়িতে ছাতুতে জল কম হওয়ায় ভাল মাখা হয়নি, তাই খাবার সময় গলায় গেল বেধে—তিনি একটু ভর্ৎসনা করে বল্‌লেন—"জল খাও।" দু'এক ঢোক জল খাওয়ার পর গলা ঠিক হয়ে গেল—বাকী ছাতু আস্তে আস্তে খেয়ে ফেললাম। শোন নদীর উপর রেলের পুল আছে কিন্তু লোক চলাচলের কোনই স্থবিধা নেই। এই পুলটা পৃথিবীর মধ্যে নাকি সবচেয়ে বড়।

শোন নদীর জল বেঁধে ফেলেছে। এই বাঁধের একদিকে নীল জল, আর একদিকে বালু প্রান্তর—তার ভেতর ৩।৪টি ছোট্ট জলের ধারা। নদীটির বুকের ওপর দিয়ে প্রায় ৩ মাইল হাটতে হলো। ডিহিরি কল্‌কাতা থেকে ৩৩৮ মাইল দূরে। শোন নদীর জল আটকিয়ে অনেকগুলি খালে জল চালানো হচ্ছে—এ জায়গাটী হচ্ছে খাল officeএর কেন্দ্র। খালগুলি জমীর উর্ব্বরতা সাধনেই ব্যবহৃত হয়। এখানে আমি Sun Bengali Clubএ গিয়ে উপস্থিত হলাম। এখানে কতক্ষণ ছিলাম—তারপর রওনা হয়ে ৩৫০ মাইলের পাথরে সসারাম পৌঁছালাম, এখানে দেবেনবাবু উকিল বেশ যত্ন করলেন। তিনি বার বারই এক প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, আমি বাড়ী হতে পালিয়ে এসেছি কি না?

এখান হতে কিছু পূর্ব্বদিকে চন্দনপিরু পাহাড়ের গুহায় অশোকের শিলালিপি আছে—এবং G. T. Roadএর নির্ম্মাতা শেরসার সমাধি আলয় আছে। সমাধি গৃহে শুধু তাঁর নয়—আরও কয়েকজন পাঠান রাজপরিবারেরও সমাধি আছে। সমাধি-মন্দিরের চারিদিক জল বেষ্টিত। তা পার হয়ে মন্দিরে যাবার জন্য ইষ্টক নির্ম্মিত সেতু আছে। মন্দিরের কাজে কারুকার্য্য শিল্পীর নিপুণতা যথেষ্ট প্রকাশ করে। খিলানের মাঝখান হতে একটি পাখীর আকারে কি যেন

ঝুলছে—বিভিন্ন স্থান হতে সেই পাখিটিকে দেখ্‌লে বিভিন্ন রূপ দেখায়—এই হচ্ছে এখানকার একটী সব চেয়ে আশ্চর্য্যের জিনিষ !

৪

রেলের লাইন আবার দেখা গেল—এবার বিশ্বস্ত বন্ধুর মত সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল মোগল সরাই পর্য্যন্ত। রাস্তায় বেশ ছাওয়া পাওয়া যায়—এখান হতে রোটাস্ পাহাড় কিছু কিছু দেখা যায়—তা ছাড়া আর পাহাড় চোখেই পড়ে না।

এখন আবার Ganges plainএ এলাম। দুধারে বুট, সরিষা, জোয়ারের ক্ষেত। এতক্ষণ রাস্তায় কাঁকর ছিল—এখন কিছু ধূলো পেলাম। জাহানাবাদে সন্ধ্যার সময় পৌছলাম। জাহানাবাদের একটু বাইরে একটী পুরাতন পুল আছে, কুদ্‌বা নদীর ওপর। এখান দিয়েই ছিল শেরসার রাস্তা—কিন্তু বর্ত্তমানে ইংরাজ বাহাদুর পুরাতনের পরিবর্ত্তে নূতন ব্যবস্থা করে নিজের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। জাহানাবাদের আর এক নাম খুরদ—খুরদাতে D. B. Bunglowতে রইলাম। এখান থেকে গাছে ঢাকা রাস্তাটীতে চল্‌তে শীতকালে তত আরাম লাগে না,—কিন্তু দেখতে ভাল লাগে। শীত করতে লাগ্‌লো বলে জোরে পা ফেল্‌তে আরম্ভ করলাম—বেলা ১২টার সময় মোহানিয়া গেলাম—সেখানে সরকারী মুসলমান ডাক্তারের বাড়ীতে কিছু জলযোগ করে দুর্গাবতীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। দুর্গাবতী পাহাড়ে নদী বর্ষাকালে বড় ভয়ানক হয়ে উঠে, লোহার ঝুলান পুল আছে নদী পার হবার জন্যে। আমার কাছে ক্যামেরা থাকলে নিশ্চয়ই ছবি তুলে নিতাম।

দুর্গাবতী থানা ঠিক দুর্গাবতী নদীর ওপরে—এখানকার দারোগা সাহেব মেহেরবাণী বর্ষণ করলেন।

G. T. Road প্রায় (সাসারাম থেকে) সব স্থানেই সরাই এবং চটি পাওয়া যায়—এগুলো এক্কাওয়ালের জিম্মায়। শেরশা ত রাস্তা তৈরি করলেন—কিন্তু তা হলেও লোক নির্ভয়ে চলাচল করতে পারতো না, পথে বাঠওয়ারাগণ লুটপাট করে নিত। শেরশা এ বিষয় জানতে পেরে নিজে ফকিরের বেশে সমস্ত দেখেন। পরে এইসব বাঠওয়ারাদের টাকাকড়ি এবং জমিজমা দিয়ে চাষ আবাদ করতে বল্‌লেন এবং যেখানে যেখানে বাঠওয়ারাদের ভয় ছিল সেখানেই চটি, সরাই, কুয়া সব তৈরী করে দেন এবং সে সমস্ত দেখা শুনার ভার এই সব পথ-দস্যুর উপর ন্যস্ত করেন। এ বন্দোবস্তে পথিকরা খুসী হয়ে এই সরাইওয়ালাদের বক্‌শিস্ দিয়ে যেত। এই বাঠওয়ারাই পরে এক্কা চালিয়ে পথিকদের যাতায়াতের সুবিধা করে দেয়—তাতে তাদের নাম হল এক্কাওয়ালা। এখনও অনেক এক্কাওয়ালা নিষ্কর জমি ভোগ করে।

১৩. ১. ২৪

রাস্তাটির দু'ধারেই জমি হইতে বেশী উঁচু। ৩৯৮ মাইলে কর্ম্মনাশা নদী পার হলাম।

পদব্রজে পেশোয়ার যাত্রী

কর্ম্মনাশা নদীর জল পায়ে লাগলে নাকি গয়া ও কাশী দর্শনের সমস্ত পূণ্যফল নাশ হয়। এরজন্যেই একজন দয়ালু হিন্দু ভদ্রলোক এই সেতু নির্ম্মাণ করে সাধারণ মানবের গয়া ও কাশী গমনের পুণ্যফল অটল রাখবার পন্থা আবিষ্কার করেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় চাঁদৌলী থানার দারোগাবাবুর অতিথি হলাম—এই ভদ্রলোকটির নাম হরিহরদিন সিং। আমি ঢাকা হতে পেশোয়ারের মধ্যে এমন একটী অতিথিপরায়ণ ভদ্রলোক দেখিনি।

১৫ই জানুয়ারী—সকালবেলা যাবার সময় হরিহরদিনবাবু কিছু মিঠায়ের পোটলা বেঁধে দিলেন। মোগল সরাইয়ে আমার পরিচিত বন্ধু রেল-লাইনটীকে ছাড়িয়ে চল্‌লাম। মোগলসরাই হতে কিছু দূর পর্য্যন্ত কোনও গাছই নেই—তারপর বেশ ছায়া। গঙ্গা পার হবার জন্য পুল আছে—একটী নৌকার পুল আর একটী O. R. R. রেল পুল। কাশীতে এসে মানস সরোবরে সন্তোষবাবুর বাড়ীতে চিৎপাত হয়ে বিছানার ওপরে শুয়ে পড়লুম।

কাশীতে বিশ্বেশ্বর মন্দির, মানমন্দির, দশাশ্বমেধ ঘাট ইত্যাদি দেখতে দেখতে দুদিন চলে গেল। ১৭ই জানুয়ারী কাশী হইতে যাত্রা করলুম। আজিমগড় রাজপ্রাসাদ বাঁয়ে রেখে —N. W. R. লাইন পার হয়ে G, T. Road পেলাম—এখান

হতে এলাহাবাদ যেতে হলে নদী একটীও পড়ে না, অবশ্য এলাহাবাদের গঙ্গা যমুনা ছাড়া। যেতে দু'পাশে অনেক আকের ক্ষেত—তখন আক কাটা হচ্ছে ও মাড়া হচ্ছে।

প্রথম দিন কাশী হতে মোটে ১৪ মাইল পথ চলে গিরজামুবাদে বেলা ২॥ টার সময় পৌছিলাম। এখানকার থানাদার সাহেব পোষ্টমাষ্টার বাবুকে দিয়ে রাত্রির ব্যবস্থা করলেন। বৈকাল বেলা কয়েকজন মিলে আক্ মাড়াই কলে গেলাম—সেখানে জ্বাল দেওয়া আকের ঘন রস ও দুধ পান করলাম। সেখান হ'তে গ্রামের মাতব্বর মহাশয় তুলার তুলিতে আতর মাখিয়ে প্রত্যেককে একটী একটী দিয়ে গেলেন—অন্যান্য ভদ্রলোকগণ পান তামাক সেবন ক'রে সেখান হ'তে গাত্র উৎপাটন করলেন।

১৮ই জানুয়ারী। ২২ মাইল পরে গোপীগঞ্জে এলাম। গোপীগঞ্জ একটী বড় বাজার, এখানে স্কুল, থানা ও কাছারী ইত্যাদি সবই আছে। এখানে আমেরিকান মিশনারীদেরও একটা আড্ডা আছে। রেভারেণ্ড মার্ফি তাহার পরিচালক—তাঁর নামে আমার কাছে একটী চিঠি ছিল। তিনি বেশ ভালো লোক, চিঠি আর দেখাতে হ'ল না—খাওয়ালেন প্রচুর। ডাঃ মশাইকে ডেকে, তিনি মিশনারী হাঁসপাতালে রাত্রি বাসের ঠিক্ করে দিলেন।

পদব্রজে পেশোয়ার যাত্রী

গোপীগঞ্জ হতে হাণ্ডিয়া পর্য্যন্ত গেলাম বেশ—এখানে যেদিন আসি সেদিন হাট বসেছিল। গুড় জিনিষটাই সব চেয়ে বেশী। অনেকে উটে করে মাল পাঠিয়ে থাকে, এখানে উট অনেক বাঁধা রয়েছে দেখলাম। এখানের থানার দারোগা মশায় লোক পাঠিয়ে ডাক দিলেন—গেলাম তাঁর কাছে। আমার কথা শুনে তাঁর কেমনতর সন্দেহ হ'ল—সেদিন আর যেতে দিলেন না। কত কথা যে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন তার অন্ত নেই। আমার দোষের মধ্যে ছিল যে, আমি কতকগুলো পোষ্টকার্ড ও এন্‌ভেলাপ সঙ্গে নিয়েছিলাম—এবং কেন চিঠি লিখি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা কোরলেন।

পরের দিন দারোগাজি দয়া করে ছেড়ে দিলেন। আমি আজ এলাহাবাদে পৌঁছব। রাস্তায় এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা, আমাকে দেখে এর আধ্যাত্মিক ভাব বিকটভাবে জেগে উঠল। আমাকে কত বুঝালেন তার অন্ত নেই। যাচ্ছেন প্রয়াগ মেলায়, রাস্তায় চলতে চলতে বাবাজীর ক্ষিদে পেল—আমারও যে না পেয়েছিল তা নয়। বাবাজীকে একটু ক্লান্ত দেখে বললাম "বাবাজী একটু জোরে চলুন"। বাবাজী এক শ্লোক আওড়ালেন—তার অর্থ এক পা চলবে, আর এক সের দুধ খাবে—তবে শরীর হবে শিবের মত মোটা। এই শ্লোকের অর্থ সম্যক ভাবে বুঝাবার জন্যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে এক গ্রামে

গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে গাছের তলায় চিমটা পুতে "ব্যোম ব্যোম" জয়ধ্বনি করলেন। ভক্তেরা আটা, ঘি, চিনি, দুধ নিয়ে এলেন। আমি, সাধুজী আর শিষ্য মিলে দাতাদের বিদায় দিয়ে সব সাবাড় করে ফেললাম। সাধুজী আজ এখানেই আড্ডা গাড়লেন—আমাকেও থাকতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু পাপী মানুষ আমি—সাধুসঙ্গ আমার পোষায় না। কাজেই সেখান হতে সরে পড়লাম।

সন্ধ্যের সময় এলাহাবাদে পৌছলাম। Paltoon Bridge ভাঙ্গা ছিল বলে খেয়াতে পার হলাম। আধাকুম্ভ মেলা উপলক্ষে তখন নানা দেশের বহু লোকের সমাগম হয়েছিল। এই উপলক্ষে আমিও গঙ্গায় স্নান করে বোধহয় কিছু পুণ্য সঞ্চয় করলাম।

বাঙ্গালা দেশে পুলিশরা বেশ অতিথি সৎকার করে। হাজারীবাগে একটু বেশ কষ্ট হয়েছিল। গয়া, সাহাবাদ এবং W. P.র নীচের দিকের লোকগুলি তত সুবিধার নয়—ঘটি হতে জল ঢেলে পান করাতেও তাদের আপত্তি আছে। ছোলা ছাতু যদিও বা দেয়—কিন্তু থালা বাটি দেবে না। গ্রামে আধ সেরেই এক সের—বিদেশী লোককে ঠকাতে তারা যথেষ্ট পটু।

৫

এলাহাবাদে মাত্র দু'দিনের ভাবেই মোহিতবাবু মোহিতদা' হয়ে গেলেন—তখন তাঁদের সঙ্গে সবেমাত্র আলাপ জমে উঠেছে—এমন সময়ে সেখান থেকে প্রস্থানের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লাম। ২২শে জানুয়ারী সকালবেলায় মোহিতদার মা'র কাছে বিদায় নেবার সময় তিনি বল্‌লেন "আর কেন বাছা, এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও"। এপর্যন্ত এমন একজন বাঙ্গালী মহিলা দেখলাম না, যিনি বললেন না, যাও একবার ঘুরে ফিরে এস।

অশ্ব, গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি নিয়ে অনেক লোকই প্রয়াগের দিকে চল্‌ছে। সাধু, শিক্ষানবিশ সাধু ইত্যাদির গতি অবিরাম প্রয়াগের মেলার দিকে। কেউ যাচ্ছেন পরমাত্মা লাভে—কেউ বা যাচ্ছেন পরম অর্থ লোভে: আমি চলছি বিপরীত দিকে—তা না হ'লে কথাবার্ত্তা বলে এদের সঙ্গে অসময়ে সময় কাটাতে মন্দ নয়।

মাওগাঁর হাট রাস্তার পাশেই বসে। কুল পেয়ারা আগেই আমার চোখে পড়েছিল—যেহেতু এর দরকার আমি অনুভব করেছিলাম।

অনেক প্রকার খদ্দরের চাদর, কাপড় এই হাটে বিক্রী হয়।

আবার দু'চার রকমের বিলাতী ও জাপানী জিনিষও পাওয়া যায়। আকের গুড়, ছোলা, গমের তো কথাই নেই।

এদেশের সব লোকেই মোটা মোটা খদ্দরের কাপড় ও চাদর ব্যবহার করে, দামও আমাদের দেশের চেয়ে অনেক সস্তা। ঘরের মেয়েরা অবসর সময়ে চরকা কাটে। এক টাকার তুলায় সূতা কাট্‌লে, ১৷০ সিকা ১॥০ টাকা লাভ থাকে। জোলারা এসে এই সূতা কিনে নিয়ে যায়। অনেকের বাড়ীতে, পুরাণো ধরণের চরকা চোখে পড়ে—সেগুলি এত মোটা ও এত ভারি যে সে চরকায় বাঙ্গালী মেয়ের হাত চলবেই না।

সন্ধ্যের সময় এলাম কোকরাজে। সরাইখানার মালিক এক্কাওয়ালা এক ডবলে (এক পয়সা) একখানা খাটিয়া দিতে রাজী হ'লো। এখানে খবর পেলাম ধনি গ্রাম মোটে মাইল দুই দূরে—সেখানকার ইয়ার মহম্মদ খুব ভালো লোক। শীতে আর কিছুতেই ভাল লাগে না, দোকানে গেলাম কাঠ কিন্‌তে—বন্ধ দেখে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে এলাম। প্রায় আটটার সময় সরাইওয়ালার প্রাপ্য চুকিয়ে—ওখান থেকে লম্বা দিলাম।

৮॥০ টার সময় ধনি গ্রামে এলাম।

ইয়ার মহম্মদের বাড়ীতে গিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করলাম।

ঘরের ভেতর থেকে উত্তর এলো—তুমি কে?

"আমি পরদেশী পথিক।"

"তোমার বাড়ী?"

"ঢাকা—বাঙ্গালা।"

"আচ্ছা বেশ ভাল কথা।"

বাজরার রুটি, আলুর তরকারী, আর গুড় দিয়ে ভোজন সমাপন করলাম।

তারপর একখানি চারপাই গোয়াল ঘরে নিয়ে গিয়ে তার ওপর খড় বিছিয়ে দিলেন। কম্বলখানি মুড়ি দিয়ে শুতেই সুন্দর ঘুম এলো।

ঘুমের ঘোরে মনে হ'লো কে যেন আমার মাথা ধরে টানছে—বাতি জেলে দেখি বন্ধন মুক্ত শ্রীমান গোবৎস। হঠাৎ বাতি জ্বালাতে গরুগুলি লাফিয়ে উঠলো, ভেড়া ভড়কিয়ে গেল। আস্তে আস্তে খুঁটির দড়ির সঙ্গে বাছুরকে বেঁধে দিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম।

২৩শে জানুয়ারী ১৯২৪

এখন থেকে রাস্তার দু' পাশে যাদের বাস তারা তত সুবিধার লোক নয়। কাজেই রেল লাইনের পাশ দিয়ে যাব ঠিক করলাম। আক্ ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দু' একখানা আক্ উঠিয়ে নিলাম, দাঁতন করবার জন্যে।

এদিকের জমিতে বেশ সোডা পাওয়া যায়। মাটির ওপর

সোডার অনেক layers দেখ্তে পাওয়া যায়, সোডা ব্যবসায়ীরা এ রকম layer গুলিকে এক জায়গায় জড় করে পরিষ্কার করে, তারপর চালান দেয়।

সন্ধ্যের সময় সিরাযুতে এলাম। ঘণ্টা তিনেকের জন্যে বিশ্রাম করে আবার চল্‌তে লাগলাম। রাত্রে যদি চলে থাকি তবে এই প্রথম চলা।

সেদিন চাঁদ উঠেছিল—কুয়াশা থাকায় জ্যোৎস্না তত স্পষ্ট ছিল না। রেল লাইনের দু'ধারে ছোট ছোট ঝোপ ঝাড়—মাঝে মাঝে দু'একটা পাখীর ডাক্ আর ঝিঁঝির ঝিঁ ঝিঁ! কন্ কনে শীতের হাওয়ায় হাড়ে পর্য্যন্ত কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়—এমনি রাতে পথ চল্‌ছি। এপর্য্যন্ত কোনদিনও কাকেও ভয় করিনি—তবে আজ কেন প্রাণে অজানা ভয় এসে জুট্‌লো জানি না।

"King, devil and angel I fear them not."

সাধক রামতীর্থ মহাশয়ের এই কথাটা বরাবর আমাকে সাহস দিয়ে আস্‌ছে—আজ এই কথাটাই সাহস দিলে। আস্তে আস্তে চল্‌তে লাগলাম। একটী ছোট রেল পুলের ওপরে বসে পড়লাম এবং চেতনা না হারিয়ে সেখানে কিছু কালের জন্যে ঝিমাবার আরাম উপভোগ কর্‌লাম।

এম্‌নি করে রাত তিনটার সময়ে খগা ষ্টেশনে পৌছলাম।

শীতের শিশিরে আমার কম্বল ভিজে গিয়েছিল। প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে পুঁটলীপ্রায় হয়ে শুয়ে পড়লাম।

যখন জাগলাম তখন বেলা ১০টা। এখানে সরকারী হাঁসপাতালের পাঞ্জাবী ডাক্তার সাতিশয় যত্ন করলেন। খাওয়া দাওয়ার পরে আর এক ঘুমে দিন কাবার করে দিলাম। রাত্রে চলে লাভের মধ্যে মিছামিছি একটা দিন নষ্ট হলো। এর পর হতে ঠিক করলাম, রাত্রে আর কোনও দিন চলবো না।

খগা থেকে রেল পথ ছেড়ে দিলাম। এখানে রাস্তাটা বড় নির্জ্জন বলে মনে হয়। এলাহাবাদ থেকে ফতেপুর যেতে একটীও নদী পার হতে হয় না। রাস্তার দু'ধারে অনেক কুঁয়া আছে—কিন্তু তাতে আমার কোনও সুবিধা ছিল না—লোটা ও রসি না থাকায়। পথের পথিক এ বিষয়ে কাকেও সাহায্য করতে চায় না। আশেপাশে বস্‌তি নেই, কাজেই কষ্ট পেতে হয়—পিপাসার সময়।

২৩ মাইলের পর ফতেপুরে (৫৭৫) এলাম। এখানে Govt. H. E. School Hostel এর Superintendent মৈত্র মহাশয়ের কাছে গেলাম। তিনি প্রথমে ছেলেদের সামনে "আচ্ছা" "খুব ভালো" ইত্যাদি বল্‌লেন, পরে একলা পেয়ে বলে বস্‌লেন—"আমার বাড়ী হোটেল নয় সে খেয়াল তোমার আছে?"

আমি—"তা নিশ্চয় আছে, আপনাকে হোটেলওয়ালা ভাব্‌বার মত সুবুদ্ধি আমার হয়নি"।

আরও দু'চার কথার পর সেখান থেকে চলে এলাম, এদিকে ওদিকে ঘুরে ফিরে বাবু হৃদয় রাম বি-এল, মহাশয়ের কাছে গেলাম। তাঁর কাছে সব রকম আরাম পেতে কোনও কষ্ট হ'লো না।

ফতেপুর সহরটী খুব ছোট এবং নিতান্ত ফাঁকা ফাঁকা। এখানে একটী জিনিশ তৈরি হয় যা দেখ্‌বার মতন। ঘোড়ার কোড়া, জরি মোড়া ছড়ি, হাণ্টার ইত্যাদি। সব চেয়ে ভালো একটী ছড়ির দাম ১৫০।৩০০ টাকা পর্য্যন্ত হয়।

১৬ জানুয়ারী ২৪

দুপুর বেলা মিঃ রাহা সিভিল সার্জ্জনের বাড়ীতে খেয়ে ১টার সময় ফতেপুর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ৫৯২ মাইলে বিন্দকি যাবার জন্যে একটী রাস্তা চলে গেছে। বিন্দকি ফতেপুরের একটী অঙ্গ—তবুও লোকে বলে বিন্দকি ফতেপুরের চেয়ে অনেক ভাল।

রাস্তায় দেখি এক গরীব বেচারাকে ধরে খুব জোর জুলুম করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, সে বেচারা পথে চলছিল —আর দু'চার খানা শুকনো কাঠের টুকরো যা পাচ্ছিল তাই কুড়িয়ে নিচ্ছিলো। রাস্তায় গাঁয়ের ক' মাতব্বর এসে তাকে

পাকড়াও করে বল্‌লে যে, সে ক্ষেতের বেড়া ভেঙ্গে কাঠ নিয়েছে। এ কাজ চুরি করা—হয় টাকা দাও, না হ'লে জেলে যাও।

কি ভয়ানক জবরদস্তির কথা! লোকটী ত ভয়েই মরা—বিদেশী লোক। অনেক বকাবকির পর তারা কাঠগুলো ত কেড়ে নিলেই উপরন্তু তার কাছ থেকে দু'টাকা আদায় করে তবে তাকে রেহাই দিলে!

এ রকম ভাবের অত্যাচার একটী রোজগারের পন্থা।

কল্যাণপুরে বাবু ছন্নুলালের কাছে এক চিঠি ছিল—ছন্নুবাবু কিছু জমি জমার ও একটী মুদির দোকানের মালিক। তিনি খাওয়ালেন বেশ—পুরী, কচৌরী, দু'চার রকমের আচার, রসদার এবং শুখা তরকারী, পেঁড়া বরফি ইত্যাদি।

ভোজনের পরক্ষণে আগুণের সামনে গিয়ে বস্‌লাম। শীতের সন্ধ্যায় আগুণের কাছে বস্‌তে ভারি আরাম লাগল। গ্রামের কয়েকজন সেখানে বসে মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে কত আশ্চর্য্য কথাই না বলছিলেন—যা আমি কোন দিনও শুনিনি!

২৭ জানুয়ারী ২৪

৩৪ মাইল রাস্তা চল্‌লে তবে কাণপুর। দু'দিকে খালি বাবলা গাছ। ৫৯৮ মাইলের কাছে পাণ্ডু নদীর পুল। ঠিক এখানেই হেভ্‌লক্ নানা সাহেবকে পয়লা চোটে হারিয়ে

দিয়েছিলেন। রাস্তায় খালি দেখ্‌তে পাওয়া যায় চামড়া চাপান গরুর গাড়ী চল্‌ছে কাণপুরে। এর দুর্গন্ধে নিতান্তই প্রাণ অন্ত করে তোলে। কাণপুরের ৬ মাইল আগে থাকতে রাস্তাটী দু'ভাগ হয়েছে। একটী চলে গেছে সহরের বাইরে দিয়ে ই, আই, আর ষ্টেশনের পাশ ঘেঁসে—আর একটী গেছে সিভিল লাইনস্‌ ও ক্যান্‌টন্‌মেণ্টের ভেতর দিয়ে। লক্ষ্ণৌ কাণপুর থেকে ৪৭ মাইল দূরে, যাবার জন্যে রাস্তা আছে গঙ্গার উত্তর ধার দিয়ে।

কাণপুর কলকাতা থেকে ৬২৪ মাইল পথ। সন্ধ্যে ৭৷৷টার সময় কাণপুরে পৌঁছলাম। কোথায় যাব কিছু ঠিক নেই। যা একখানা চিঠি ছিল তা ফ্যাক্টরীর ঠিকানায়। কোথায় থাক্‌বো ভাবতে ভাবতে চলছি, এমন সময় আর্য্য সমাজের নব নির্ম্মিত মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়ালাম।

সেদিন রবিবার। বেদিতে হোম করা হচ্ছিল, আর সবাই মিলে মন্ত্র পড়ছিলেন। আর্য্য-সমাজের সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

এঁদের উপাসনায় যোগ দিলাম, উপাসনার পরে এক বক্তৃতা হ'লো। বক্তা বার বারই বলতে লাগলেন—"সাহেব নে কহা হ্যায়।" নিজের কিছুই ছিল না। তিনি সাহেবের মন্তব্য ব্যক্ত করেই আর্য্য ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করছিলেন। "সাহেব নে কহা হ্যায়।"—কথাটী আমি গুণে দেখেছি তিনি

১৫ মিনিটে ৮৫ বার উচ্চারণ করেছিলেন।

উপাসনা সাঙ্গ হ'লে একজন ভদ্রলোক (জ্বালা প্রসাদ বি-এল) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি কি ইসাই—এখানে বোধহয় শুদ্ধি দীক্ষা গ্রহণ করতে এসেছেন, নয় কি ?

"আজ্ঞে না—আমি একজন হিন্দু বাঙ্গালী পথিক, আজকের জন্যে একটু স্থান চাই।"

জ্বালাপ্রসাদের হুকুমে আর্য্য সমাজের চাপরাশি মন্দিরের ভেতর একখানি চারপাই দিয়ে, বাইরে থেকে দরজায় তালা বন্ধ ক'রে চলে গেল। প্রকাণ্ড হলের এক প্রান্তে আমি চার-পায়ে শুয়ে—কি ভয়ানক অন্ধকার।

হোমের আগুন তখনও নেভেনি। কতকগুলো বাঁশের লম্বা লম্বা টুকরো পড়েছিল। এ গুলোর মাথায় ছোট ছোট নিশান বাঁধা হয়। এ রকম গোটাকয়েক টুকরো পুড়িয়ে বেশ আলো ও তাপ পেলাম। পুরাণো একখানা খবরের কাগজ সঙ্গে ছিল—তারই খবরগুলি নূতন করে পড়লাম। ভোর না হতে চাপরাশি দরজা খুলে দিলে—আমিও বেড়িয়ে এলাম। জ্বালাপ্রসাদকে আর জ্বালাতন করবার কোন দরকার দেখ্‌লাম না।

সকাল বেলা Harness & Saddlery Factoryতে Mr. A. H. Haul সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম—তিনি

আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন এবং ভদ্রলোকদের কাছ থেকে রাস্তার জন্যে চিঠি পত্র যোগাড় করে দিলেন। তারপর বিশ্বেশ্বর বাবুকে ডেকে সমস্ত ব্যবস্থা করে দিতে বলে গেলেন।

আগাকুঠীর বাঙ্গালীরা আমাকে দেখে বল্‌লেন "আমাদের এখানে এলেন না কেন?"

উত্তর দিলাম "আপনাদের যে পাত্তা জানতাম না"।

তাঁরা আমায় পেয়ে খুবই খুসী হয়েছিলেন, এ বিষয়ে অ সন্দেহ নেই।

বিকাল বেলা Memorial Well (যে কুঁয়াতে নানা-সাহে ইংরাজদের মেরে কেটে ফেলে দিয়েছিলেন) আর সরকা কৃষি কলেজ দেখে বাসায় ফিরলাম। কানপুরে কৃষি কলে দেখবার মত জিনিষ।

৬

৩০ জানুয়ারী ২৪

যাচ্ছি যাচ্ছি করেও বেলা ১২টার আগে নড়তে পারলাম না। এখান থেকে B. B. & C. I. রেল লাইন রাস্তার পাশে পাশে চলেছে গুরসাইগঞ্জ পর্য্যন্ত। এ পথ আর ওপথের মাঝে শুধু তারের বেড়া। Motor Guideএ লেখা আছে কল্যাণপুর কানপুর থেকে ১০ মাইল দূর—কিন্তু দূরত্ব মোটে ৩ মাইল। এ রকম ভুল বইখানিতে মাঝে মাঝে আছে।

বিঠুর, যেখানে নানা সাহেবের বাড়ী, এখান থেকে মোটে আট মাইল দূরে—গঙ্গার তীরে। এত কাছে পেয়ে বিঠুর ছেড়ে যেতে আর ইচ্ছে হ'লো না।

বিঠুর সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে কানপুরের চেয়ে বড় সহর ছিল। বড় বড় বাড়ী ঘর দুয়ার সবই ছিল। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে নানা সাহেবের লড়াই বাধ্‌ল—নানা সাহেব তো পালিয়ে নানা দেশ ঘুরলেন—মাঝে থেকে ইংরেজ তোপ দেগে বিঠুরের সমস্ত ঘর বাড়ী চুরমার করে দিলে। এই সঙ্গে নানা সাহেবের সাধের মেয়ে ময়নাও মারা গেল।

এখান থেকে পুরার দিকে চল্‌তে লাগলাম। ৬৪৮ মাইলে লোনা নদী পার হয়ে পুরায় পৌঁছলাম। পুরা একটী ছোট্ট

বাজার, কয়েক ঘর মহাজনের বাস—তাদের মনের ওজনে কারবার। দু'চারখানা চানা দানার দোকান আর কয়েকটা বড় বড় গাছ। গাছের তলায় সন্ধ্যাবেলায় গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরা গরুগুলোকে দানাপাণি দেয়, নিজেরা চাপাটি বানায়, আর বিচালি বিছিয়ে তার উপর শুয়ে রাত কাটায়।

বেনিয়া, মুদী জাতীয় দোকানদারগুলো, কোনদিনও বিদেশী লোকের সাহায্য করবে না, তাই এখানে নিম্নপ্রাথমিক স্কুল ঘরে গেলাম। পণ্ডিত মহাশয় পড়ুয়াদের পদরেণুতে পরিপূর্ণ একখানা দরি (সতরঞ্চি) দিলেন।

বাস্তবিক পুরাতে পুরোপুরিই কষ্ট পেতে হয়েছিল।

১লা ফেব্রুয়ারী ২৪

৬৬৩ মাইলের কাছে ঈশান নদ। এর পুলের ওপর দিয়ে রেলের লাইন আর রাস্তা দুই-ই চলে গেছে।

এদিকের লোক—এই কানপুর থেকে মৈনপুরীর মধ্যে যাদের বাস, তারা মোটেই সুবিধের লোক নয়। কথায়, ব্যবহারে সবটাতেই একটু কেমন, কেমন।

৬৭০ মাইলে সরাই মিরাতে থামলাম। এখান থেকে কনোজ প্রায় তিন মাইল হবে—একটা শাখা পথে যেতে হয়।

কনোজে প্রথমে হাসপাতালের ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "কি চাও" ?

আমি বল্‌লাম, "থাকতে চাই—খেতে চাই।"

উত্তর হ'লো "কোনটাই হবে না, সিদে সরে পড়। এটা দাবাখানা—তোমার অসুখ হয়ে থাকলে তুমি ওষুধ পেতে পারো।"

"আমার অসুখ হলো ক্ষিদে, ওষুধ দিতে পারেন কি?"

অবশ্য বল্‌তে হবে না যে আমার এ রকম উত্তরে কোন ফল হয়নি।

জুবিলী হাইস্কুলের ছেলেরা আমাকে তাদের হোষ্টেলে থাকতে অনুরোধ করলে, হোষ্টেলের সুপারিটেন্‌ডেন্ট মশায় তাদের ডেকে চুপি চুপি কি বল্‌লেন। কিন্তু ছাত্ররা, পরে আমার কাছে সে গুপ্তকথা ব্যক্ত করেছিলেন। উপদেষ্টার (সুপারিনটেন্‌ডেন্টের) কথার মর্ম্ম ছিল এই যে, আমি রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িত (যদিও নয়)—যেহেতু আমার বাড়ী বাংলায়। অতএব আমার সহিত মেশা উচিত নয়। আর যদি তারা (হোষ্টেলবাসী ছেলেরা) এ কথা না শুনে, তবে তাদের হোষ্টেল ছেড়ে যেতে হবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই আদেশ মান্য করবার মত কোন লক্ষণ একটী প্রাণীর মধ্যেও দেখা গেল না।

বিকাল বেলা কনোজের গম্বুজওয়ালা পুরাণো মস্‌জিদগুলো দেখতে গেলাম। রাজা জয়চন্দ্রের সময় এ মস্‌জিদগুলো

মন্দির ছিল—মহম্মদ ঘোরি এসে মন্দির ভেঙ্গে মস্‌জিদ্ গড়েন। আগে মন্দিরের পশ্চিমদিকে দরজা ছিল কিন্তু মস্‌জিদ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে সব বন্ধ করে ফেলা হয়। একটু নজর করে দেখলেই এ সব ধরা পড়ে। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির টুক্‌রোগুলো দিয়ে দেয়াল গাঁথা। গেল বছর এরই একটা মস্‌জিদে বাজ পড়ে দেওয়াল ফেটে গিয়েছিল—তাতে দেবদেবীর মূর্তির কয়েক টুক্‌রো কিছুদিনের জন্যে বেরিয়ে পড়েছিল। দুটী মস্‌জিদের ভেতরে কবরের মত আছে—লোকে বলে এগুলো বিলকুল নকল।

মস্‌জিদের খিলানে দেওয়ালে রং দিয়ে অনেক লতাপাতা আঁকা আছে। রং দিয়ে আঁকা হয়েছিল সে কবে কিন্তু তার চক্‌মকানি আজও আছে।

এর পর জয়চন্দ্রের কেল্লা দেখতে গেলাম। কেল্লার কিছুই নেই—শুধু এখানে সেখানে ভাঙ্গা ইটের স্তূপ। গঙ্গাবিষুন বল্‌লেন "এদিকে আসুন, আপনাদের একটা কুঠরী দেখাচ্ছি।" তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন—থামলেন গিয়ে অড়হর ক্ষেতের ভেতর। সে জায়গাটী আমরা সবাই মিলে, কয়েকটা ইট সরিয়ে আর দু'দশটা অড়হর গাছ তুলে পরিষ্কার করতেই একটী রাস্তা আবিষ্কার করে ফেল্‌লাম। দু' তিন হাত নীচে নেমে গিয়ে একটী সেঁতসেতে কুঠরীতে এলাম—ঘরের মেঝে খুব পেছল, দেখবার কিছুই নেই।

এর কাছাকাছি যত উঁচু জায়গা দেখতে পাওয়া যায় সবটাই জয়চন্দ্রের কেল্লা। আগে গঙ্গা এই কেল্লার কাছ দিয়ে বইতো —এখন গঙ্গা এখান থেকে প্রায় ২-২॥ মাইল দূরে বইছে। কেল্লার সমস্ত জমিটাই এখন তামাকের আর অড়হরের চাষে নিয়োজিত।

এর পর বাজারে গেলাম, এখানে ১২০ তোলায় এক সের। গোয়ালিয়রের পয়সা এই বাজারে প্রথম চোখে পড়লো। গোয়ালিয়রের পয়সা ফরাক্কাবাদ, মৈনপুরী, আগ্রা, এটাওয়া প্রভৃতি অঞ্চলে চলে।

এখানে খালি স্থগন্ধি দ্রব্যের কারবার—অস্‌লি আতর থেকে আরম্ভ করে নকল চামেলীর তেল, সবই এখানে তৈয়ার হয়। কনোজে গন্ধ দ্রব্যের ব্যবসা যে কত বড় তা সহজেই অনুমান করা যায়, রাস্তা দিয়ে চলবার সময় স্থগন্ধের আঘ্রাণ পেয়ে।

কনোজের পরে গেলাম গুরসাইগঞ্জে। এখান থেকে B. B. & C. I. রেল লাইন অদৃশ্য হয়ে গেছে। ৬৮৪ মাইল থেকে G. T. Road এর মত আর একটী রাস্তা চলে গেছে ফরাক্কা-বাদে—দু'টা রাস্তা দেখতে ঠিক এক রকম। গুরসাইগঞ্জে Mr. Mathewর বাড়ীতে জলযোগ করে, রাত্রে ধর্ম্মশালার পুরী তরকারী খেয়ে, শয়নের আয়োজন দারোগাজীর ঘরে করলাম।

৩রা ফেব্রুয়ারী ২৪

৩৫ মাইল অতিক্রমের পর রাত্রি ৮॥টার সময় ভোগাঁও (৭২৫) পৌঁছলাম। রাস্তায় ছিব্‌রামুহ, নবিগঞ্জ, রেওয়া নামক স্থানগুলোর প্রত্যেকটাই ভাল। রেওয়ারে ফরাক্কাবাদ এটোয়া রোড ৭১৮ মাইলে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড Cross করেছে।

লোকে বলে ভোঁগাওবাসীরা ভারি বোকা। কেউ কিছু বোকামির কাজ করলে তাকে বলা হয়—"তুমি কি ভোগাঁওএর রহনেওয়ালা ?" এখানে চুটি মাইল পাথর ভুল করে খুব কাছাকাছি বসান হয়েছে—একটী থেকে আর একটার দূরত্ব ১০০ গজের বেশী হবে না। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের আর কোথাও ভুল নেই—শুধু এখানে। লোকে এই ভুলটীকে ভোগাঁওএর মূর্খতা হিসাবে গণ্য করে থাকে।

এখানে চুধ খুব সস্তা। মহিষের চুধ টাকায় ২০ সের পর্য্যন্ত পাওয়া যায়—ছাগলের চুধ আরও বেশী। অনেকখানি চুধ পান করে, রেল ষ্টেশনে বেঞ্চের উপর পড়ে রইলাম।

৭

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—২৪

ভোগাঁও থেকে আগ্রা রোড দিয়ে মোটে ১০ মাইল চলে মৈনপুরীতে এলাম। ফুলবাগের পাশেই বড় ডাকঘর—পোষ্টমাষ্টার রামপ্রসাদবাবুর অতিথি হ'লাম। ইনি নিতান্ত ভদ্রলোক ও খাঁটি হিন্দু—যদিও গোঁড়ামীতে পরিপক্ক নন।

মৈনপুরীর মত পুরোণো সহর খুবই কম আছে। এ সহর মহাভারতের সময়কার। হিন্দুদের রাজত্বকালে মৈনপুরী কনৌজের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু মুসলমানদের আমলে ইহা স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে এবং তাহাদের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। বিনায়কপুর ও মৈনপুরীর সমাবেশে বর্ত্তমান মৈনপুরী। বিনায়কপুর পত্তন করেন রাজা যশোবন্ত সিংহ। স্ত্রী-শিশু হত্যা এদেশে এরকম ভাবে চল্‌তো যে তা আর বলবার নয়, এমন সময় ছিল যখন এ দেশে একটী ছোট মেয়েও ছিল না। এই অমানুষিক লীলার প্রধান পাণ্ডা ছিলেন রাঠোর রাজপুতরা ও আহিরীরা। ডাকঘর থেকে সহর, অর্থাৎ বাজার প্রায় ১½ মাইল। ঈশান নদের পুলের উপর দিয়ে যেতে আগ্রা রোড ছেড়ে ডাইনে বাঁয়ে গেলে, সহর বলে ততটা আর মনে হয় না, বরং গ্রামের মতন বলেই মনে হয়।

পূর্ব্বে এখানে যথেষ্ট পরিমাণে সরকার সূতা পাওয়া যেত—তবে আজকাল তেমন না হলেও কম পাওয়া যায় না।

কৈমগঞ্জের তামাক, গুঁড়ো তামাকপাতা চুনের মতন ক'রে করা—খাকী হুকাটির মত দেখতে—খুব প্রসিদ্ধ। হুকা বাটীর বাহাদুরী আছে—নিতান্ত তারিফ না করে পারা যায় না।

২২ ফেব্রুয়ারী—২১

দুদিকে গাছপালা কিছু নেই খাঁ খাঁ মাঠ। শিকোহাবাদের দিকে চললাম। Lower Ganges Canal (সেটা হরিদ্বার থেকে কানপুর পর্য্যন্ত চলেছে) পার হয়ে শিকোহাবাদে এলাম। এখানে একজন ভদ্রলোকের কাছে আশ্রয় চাইতে তিনি বল্লেন, "দেখ তোমাকে স্থান দিতে কোনও আপত্তি নেই—তবে কিনা বুঝলে, এই তো সেদিন গোপীনাথ ডে-সাহেবকে খুন করে মেরে ফেল্লে—তুমি তো বাপু তাদের দলের কেউ হতে পারো, মানে আমি একটা কথার কথা বলছি—বুঝলে কি না?"

এই রকম কথা শুনে তখনই বুঝলাম এখানে কিছু হবে না।

একটা বাড়ীর বারাণ্ডায়, দেয়ালে হেলান দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বেসে পুঁটুলি হয়ে বসে আছি, শীতে ঠক্ ঠক্ করে

কাঁপছি আর বাড়ীর কথা ভাবছি—আঃ কি আরামেই না ঘুমিয়ে পড়তাম !

দিব্যি চমৎকার বিছানা—লেপ মুড়ি দিতেই চমৎকার ঘুম হ'লো। হঠাৎ এক ব্যাটা চোর এসে লেপখানা নিয়ে দে ছুট ! "চোর" "চোর" বলে চেঁচিয়ে উঠলাম একটা পাহারাওয়ালা যাচ্ছিলো, সে মাটির উপর লাঠি ঠুকে জিজ্ঞাসা করলে "হুয়া কা ?"

আমি বল্‌লাম "চোর নে মেরা রেজাই চোরি কর্‌কে ভাগ গিয়া"।

আমার কথা শুনেও শুন্‌লে না। "পাগল হ্যায় না কা"—মন্তব্য করে অন্য দিকে চলে গেল।

মুরগী ডেকে উঠ্‌ল, কাকের কনসার্ট সুরু হ'লো—কোথায় লেপ আর কোথায় বিছানা। আহা এত আরামের ঘুম কিনা এম্নি কন্‌কনে শীতের ভোরে ভেঙ্গে গেল।

৬ই ফেব্রুয়ারী—২৪

মাঝে মাঝে ছোটখাট খাল এবং নালা পার হতে হচ্ছে, এগুলো জমির উৎকর্ষতা সাধনে ব্যবহৃত হয়। "ক্রোশ অন্তর ধুয়ে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা"—তাই সময় সময় পা ধুয়ে নিতাম, সমস্ত ক্লান্তি যেন দূর হয়ে যেতো।

পথে এক সাধুর সঙ্গে দেখা। গাছতলায় বসে নেশার-রাজা

গাঁজার শ্রাদ্ধ করছিলেন। ছায়া দেখে বড় লোভ লাগ্‌লো—বিশ্রাম উপভোগ করবার জন্যে। তাই সেখান বসে পড়লাম। নাক দিয়ে ধুঁয়োর ফোয়ারা বের করে, বাবাজী প্রয়াগ থেকে কি রকম ফিকির ক'রে আস্‌ছিল, মাঝে কি কি ঘট্‌লো ইত্যাদি উপাখ্যান উদ্গীরণ করতে লাগলেন। হঠাৎ ষ্টেশনে এক ফিরিঙ্গি চেকার পথরোধ করাতে ঘোরতর অবিচার আরম্ভ হ'লো। ঈশ্বর আছেন এটা সত্য কথা। কেন না সাহেবটা যখন তাহার ঝুলি ঝোলা, লোটা লাঠি সমেত তাহাকে পুলিশে দেবার ব্যবস্থা করছিল তখন ভগবান আর কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না। জনৈক হিতৈষীকে বললেন, বাবাজীকে কষ্ট হতে মুক্ত কর। তখন প্লাটফরমে দেখা গেল, একজন ভুড়িওয়ালা ভক্ত।

তিনি "গোড় লাগি বাবাজী" বলে, বাবাজীর কষ্ট দূর করলেন রেল কোম্পানীর প্রাপ্য চুকিয়ে। পরমাত্মার অনুরোধে এখন আর বাষ্পযানে যাবেন না—ফিরোজাবাদে গিয়ে অবশ্য সে চেষ্টা দেখবেন। আর আজ কোনও গ্রামে গিয়ে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিরাজ করবেন।

তারপর ফিরিঙ্গিটার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধারের জন্য যখন সুরসাল ভাষায় সুললিত ছন্দে বন্দনা আরম্ভ করলেন, তখন বিশ্রামক্লান্ত অলস অবশ দেহখানিকে ফিরোজাবাদে চালান দেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়লাম।

ফিরোজাবাদে পৌঁছে ইচ্ছে হ'লো আজ সরাইয়ে থাকবো। সরাইওয়ালাকে একটী চারপাই দিতে বললাম। সে যা দিলে, তাকে আড়াই পায়া বল্লেই চলে। চার পায়ার মধ্যে একটী পায়া গৃহত্যাগী হ'য়ে কোথায় চ'লে গেছে, কাজেই কতকগুলি অকর্ম্মণ্য ইটকে সাজিয়ে তার স্থানে অভিসিক্ত করা হ'লো। আর একটী পায়ার মাঝখানটা ভাঙ্গা, দড়াদড়ির কসাকষিতে বেচারা কোন মতে দাঁড়িয়ে আছে।

আবর্জ্জনায় সরাইখানা ভর্ত্তি। ভাঙ্গা দেওয়াল, সেঁতসেঁতে মেঝে। সরাইওয়ালা একটা বাতি দিয়ে গেল—মান্ধাতার আমলের চিমনি, একদম ফাটা। আঠা দিয়ে আঁটা কাগজের বেণ্ডেজে বেচারার চিমনিত্ব প্রায় লুপ্ত। চিমনি যেন একটী ছোটখাট Factoryর চিমনি, খালি ধোঁয়া। আবার সেটী এমনি কালো—যে আলোর চেয়ে ছায়াই বেশী হয়। দিলাম বাতি নিবিয়ে।

খাটিয়াটীতে যে ছারপোকার চাষ নির্ব্বিবাদে হচ্ছিল, তা অল্পক্ষণ পরেই বুঝতে পারা গেল। তাই ঠিক করলাম, এর পর আর কোনও দিনই সরাইতে যাবো না।

আমি সরাইওয়লাকে বললাম, এমন নোংরা জায়গায় এত অসুবিধায় মানুষ কি থাকতে পারে। সে তখন নবাবী আমলের কথা জুড়ে দিলে—আগে, সন্ধ্যাবেলা কত মুসাফের আসতো—

গানবাজনা গল্পগুজবে বিলকুল সরাইখানা মসগুল হয়ে থাকতো। এখন সেদিনও নেই আর সরাইয়ের সে হালও নেই। কপাল চাপড়িয়ে বিশেষ ভাবে আপশোষ করতে লাগলো। আমি দেখি, পালা আর শেষ হয় না, তাই বকশিসের আশা দিয়ে কোন রকমে তার হা হুতাশ প্রসঙ্গ খতম করলাম।

এখানে অনেক রকম কাঁচের চুড়ি প্রচুর পরিমাণে তৈরী হয়, এর জন্যেই ফিরোজাবাদের প্রসিদ্ধি এবং সমৃদ্ধি।

৭ই ফেব্রুয়ারী—২৪

আজ আগ্রায় যাবো। কয়েক মাইল চলার পর খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। তাই তূণ্ডলাতে এসেই একচোট পুরী তরকারী তাড়াতাড়ি সাবাড় করে ফেললাম। নূতন ষ্টীমে চলতে লাগ্‌লাম। গতির বিরতি নেই, বিশ্রাম নেই. খালি চলা, উৎসাহের উৎস পুরো দমে খুলে গেল—আগ্রা যাবো কি না তাই! লোকজনের আনাগোনা আছে। পথে বেশ দু'চারখানা মোটর ধূলো উড়িয়ে জানিয়ে গেল—এ সড়কে চলা মটরেরই মানায়।

Steel Bridgeএ যমুনা পার হলাম। যমুনার অপর পার থেকে আগ্রার দৃশ্য তত মনোরম নয়, যত মনোরম কাশীর দৃশ্য গঙ্গার ওপার থেকে।

বেশ বেলা ছিল। বিশ্বের বিস্ময় তাজমহল দেখবার জন্য ছুটে চললাম—যমুনা নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে।

খানিক আগে এক পশ্‌লা বৃষ্টি হয়েছিল, তাতে তাজমহলের বাগান আরও সরস এবং সুন্দর দেখাচ্ছিল। দু'এক টুকরো মেঘ পানসী তরীর মতন ভেসে বেড়াচ্ছিল নীলিমা অঞ্চলে—আবার তারই আড়ালে অস্তমিত রবির রঙ্গীন আলোটুকু সদ্যস্নাত তাজকে যে কতখানি পবিত্র এবং স্নিগ্ধ করে তুলেছিল তা না দেখলে, কল্পনায় সে ছবি আঁকা যায় না।

প্রাণের প্রিয়া মমতাজের জন্যে, সমস্ত মমতা দিয়ে গড়া এই অশ্রুসিক্ত অমর স্মৃতি—চিরদিন প্রেমিকের তপোবন।

"কে বলে মর্ম্মর এ যে মর্ম্মের কাহিনী।"

ইহার পর তাজ ভাল করে দেখলাম। মিনারে উঠলাম, মিউজিয়ামে গিয়ে তাজের নাড়ী নক্ষত্র মিলাইলাম, আসল নকল কবরের বাহার দেখলাম। কিন্তু দূর হতে দেখে যত আনন্দ পেয়েছিলাম, তত আর পেলাম না। বড় জিনিষ দূর হইতেই ভাল দেখায়। হিমালয়ের সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় দূর হতেই। দূরত্বেই মহত্ব বাড়ে।

চায়ের দোকানে চা খেতে গেলাম—অবসাদ দূর করবার জন্যে। আমার পাশে বসেছিলেন একজন ভদ্রলোক—তিনি সৈন্য বিভাগে কাজ করতেন। অল্প স্বল্প আলাপের পর তিনি

বাঙ্গালীদের ভারী নিন্দে আরম্ভ করলেন। বললেন কিনা, বাঙ্গালীরা ভারি ভীরু, যুদ্ধের আগে বেশ লাফায় ঝাঁপায়— তারপর দু'চার আস্‌মানী আওয়াজ শুন্‌লেই বিলকুল ঠাণ্ডা। '৪৯' পল্টনের বীরত্ব কাহিনী কীর্ত্তন করলাম—কিন্তু "কোনও না ফলিল ফল।"

তবুও লোকটা বলে কিনা, তাদের কাছে কীরিচ-বন্দুক ক্রীড়াকন্দুক, আর আমাদের—বাঙ্গালীদের—বুক ধুক্ ধুক্। ইচ্ছে হ'লো, একখানি চড় কসিয়ে বুঝিয়ে দেই অন্ততঃ বাঙ্গালীদের চাপড়ের জোর আছে। কিন্তু সে যে আমাকে পিষে ফেলতে পারে এ বিশ্বাসটা আমার যথেষ্ট ছিল, তাই নিঃশব্দে চায়ের শেষ চুমুক দিয়েই হঠাৎ সংযমী বনে গেলাম।

কোথায় থাকব, কার বাড়ীতে গিয়ে হঠাৎ উঠব ভাবছি। এ সময় দেখি, একজন কোট-প্যাণ্টধারী, মাথা খালি ভদ্রলোক চলেছেন।

'যখন দেখিবে ভাই
শিরোপরি কিছু নাই
তখন জানিবে মনে—নিশ্চয় বাঙ্গালী'।

বাঙ্গালী না হইয়া আর যায় কোথা। ইনি অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘটক—কালী বাড়ীর কাছে থাকেন। খুব আদর ক'রে আমায় তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

পদব্রজে পেশোয়ার যাত্রী

৮ই ফেব্রুয়ারী—২৪

আবার Steel Bridge পার হয়ে আগ্রা রোডে এলাম। পুলটা থেকে একটু দূরেই, ঠিক্ রাস্তার পাশেই ইৎমাদ্উদ্দৌলা। দেখ্তে বেশ, তবে তাজমহল দেখে এ আর ভাল লাগলো না।

এখন আলিগড় অভিমুখে চল্‌বো। তবে আজ যাবো হাথ্রাস—দূরত্ব ২৮ মাইল। দু' দিকে নিমগাছের সারি। বৃষ্টিতে বড় কাদা হয়েছিল, তাই ভারি অসুবিধা হচ্ছিলো চল্‌তে।

শীত করছিল তাই কম্বলখানা গলা থেকে পা পর্য্যন্ত ঝুলিয়ে কতকটা আলখাল্লার মতন করে নিলাম।

এতদিনে আমার একটী ভক্ত জুট্‌লো। তার প্রথম সম্ভাষণই হ'লো "মহারাজ"। মামুলি ২।১টা লম্বা চওড়া কথা বল্‌তেই (অন্ততঃ ২।১ বার সাধু সহবাসে কিঞ্চিৎ মাত্র ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছিলাম) সে বেচারা বলে বস্‌ল, আমি গৃহত্যাগী নবীন সন্ন্যাসী।

মহারাজের ভোজনের যোগাড় কোথায় হবে। তার বাড়ীতে মহারাজ যদি সেবা করেন, তবে সে বিশেষ অনুগৃহীত হবে—ভক্ত ভক্তিরসে আপ্লুত। তাই, তার বাড়ীতেই ভোজন করলেও করতে পারি—এ রকম আভাষ দিলাম।

হঠাৎ ভক্ত ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে মুখখানি বিকৃত করে বলে উঠ্‌লো "তঁই নে ইসাই হো" ? (তুই খৃষ্টান !) আমি অবাক্। কি যে বলে মাথা মুণ্ডু ! মহারাজ থেকে একেবারে "তুই" !

"From what height to what pit you have fallen":

ওহো বুঝেছি—আমার পরণের হাপ-প্যাণ্টটী তার নয়ন গোচর হয়েছে—এতক্ষণ কম্বল আবরণে ঢাকা ছিল। আর কি কথা আছে—আমি খৃষ্টান হয়ে গেলাম।

বড় দুঃখ হ'লো ভক্তের জন্য—আহা ভোজনটা এম্নি ভাবে ফস্‌কে গেল।

আগে যদি জানতাম, তবে কাপড় পড়ে থাকৃতাম। প্যাণ্টটা বড় আপদ সৃষ্টি করে। মনে করলাম, এর পরেই এটাকে বিদায় দেব। না থাক—"হই হবো অপমান শ্যামের লাগিয়া", আমার যেম্নিটী আছে তেম্নিটী থাক।

সন্ধ্যের ঘণ্টা খানেক আগে হাথ্‌রাসের সীমানায় পৌঁছলাম। হাথরাস Encamping groundএ একদল সৈন্য ছোট ছোট তাঁবু খাটাচ্ছিল। খোলা মাঠ, এক কোণে একটা কুয়া, দু'চারটী গাছ নিয়েই Encamping ground. পূর্ব্বে এ রাস্তা দিয়ে সৈন্য সামন্ত, যুদ্ধের সরঞ্জাম রসদ ইত্যাদি পাঠান হ'তো—তার জন্যেই এ রকম Encamping ground তৈরী হয়েছিল।

বর্দ্ধমান যেতে বরাবর গ্রাণ্ড টাঙ্ক রোড কত যে পাওয়া যায়, তার ইয়ত্বা নেই।

ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ কে, এন মিত্রের ওপর একখানা চিঠি ছিল। গেটের দরোয়ানটা তো কিছুতেই যেতে দেবে না, অগত্যা অনেক খোসামুদির পর সে চিঠিখানা মিত্র মহাশয়ের কাছে পাঠিয়ে দিতে রাজি হ'লো—আমিও বাঁচলাম। মিত্র মহাশয় সশরীরে (বিরাট শরীর) হাজির হলেন, সাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

"তা বেশ, বেশ করেছেন—ভাত মাছ ছেড়ে রুটি ডাল খেয়ে মরতে কেন এলেন" বলে, আমার দিকে একটু হাস্‌লেন। তাঁর বৃহৎ দেহখানির দিকে চেয়ে উত্তর করলাম "আপনার মত শরীর নিয়ে মরাও যে সুখের"।

তিনি এতস্থ দগ্ধোদরের জন্য ভাতের প্রার্থনা সহাস্যে মঞ্জুর করলেন।

হাথরাস সহরটা ভারী নোংরা। যেমনি বাড়ী-ঘর দুয়ারের চেহারা, তেমনি রাস্তার বিকট অবস্থা। এখানে তুলা ginning করবার জন্য অনেকগুলো ফ্যাক্টরী আছে। এ তুলা যদিও যুক্ত প্রদেশে উৎপন্ন হয় তবুও একে "বাংলা" তুলাই বলে।

এখান থেকে বৃন্দাবন প্রায় ৩০ মাইল—যাবার জন্যে বেশ ভাল রাস্তা আছে।

৯ই ফেব্রুয়ারী—২৪

১টার সময় হাথরাস থেকে রওনা হলাম। আলিগড় এখান থেকে ২২ মাইল, রাস্তায় উটের গাড়ি অনেক চলে। এ রকম শুধু আলিগড় জিলাতেই দেখা যায়। দু'দিকেই পড়ো জমি—একটাও নদী নালা পড়ে না। আগ্রা রোড আলিগড়ে গিয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গে মিশেছে। ৭টার সময় আলিগড়ে পৌছলাম। লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করতে করতে সিন্নি-কি সরাইএ (একটা মহল্লার নাম) হাজির হলাম। হাকিম গঙ্গাপ্রসাদ রাজবৈদ্যের নিকট একখানা চিঠি ছিল। খুঁজে খুঁজে তাঁর দরজায় পৌছলাম। তাঁর বাড়ীতে আমার কোনওরূপ অযত্ন হলো না।

দু'চারজন বাঙ্গালীর কাছে গিয়েছিলাম ভাতের প্রত্যাশায়, "তাঁরা হ্যা না হ্যা—তা বেশ" এই রকম ধরণের লোক।

৮

১০ই ফেব্রুয়ারী—২৪

আলিগড় স্থানীয় মোসলেম ইউনিভার্সিটির জন্য বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ। সার সৈয়দ মহম্মদের বিপুল উদ্যমে আলিগড় ইউনিভারসিটি স্থাপিত হয়—থিয়োডর বেক্ এ কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন। বল্‌তে গেলে তিনি এ কলেজের উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

ছাত্রগণ ধর্ম্ম পালনের দিকে বড় কড়া নজর রাখেন। বেশীর ভাগেরই মাথায় লাল টুপি ও গায় কাল লম্বা কোট। তাঁরা একটু গম্ভীর রকমের ও ধর্ম্মের নামে কিঞ্চিৎ গোঁড়া। দু'চার জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘট্‌লো—তাদের ব্যবহার বেশ ভাল।

তালা তৈরী, মাখন জোগান ও চাম্‌ড়ার ব্যবসায় আলিগড় বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করেছে।

১১ই ফেব্রুয়ারী ২৪

সকাল বেলা আলিগড় থেকে সটকান দিলাম। ১২ মাইল চলবার পর গভানায় (৮৬৩ মাইল) এলাম। শরীরের অবস্থা ভাল ছিল না। তার জন্য গভানা হাঁসপাতালে আশ্রয় নিলাম। ডাং দেওয়ান রাম ওষুধ পত্রের ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রবোধ

বাবু গভানার কুমার সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। কুমার সাহেব নিমন্ত্রণ করলেন—তাঁর সঙ্গে খাবার জন্য। অল্প জ্বরে পথ্যের যথেষ্ট অবিচার হয়েছিল—সন্দেহ নেই।

কুমার সাহেব গভানার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। তিনি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশেই বাজার, পান্থশালা, বাগ-বাগিচা, হিন্দুদের জন্য মন্দির ও মুসলমানদের মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়েছেন। নিজে খাঁটি হিন্দু হলেও অন্য ধর্ম্মের প্রতি তিনি যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে অবহেলা করেন না।

১৩ই ফেব্রুয়ারী' ২৪

রাত থাকতে উঠে কুয়োর জলে স্নান করে নিলাম। অবশ্য স্নান করবার পর ১০ গ্রেণ কুইনাইন গিলতে কোনও ভুল করিনি। ডাক্তারবাবু না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়লেন না।

তখন সবেমাত্র পূবে আলোর রেখা ফুটেছে। শীতের হাওয়ায় শিশির ভেজা গাছগুলি সব শিউরে উঠ্ছে। পাখীর গান আজ এই অভাগাকে অচেনা দেশের জন্য ডেকে নিলে। এই সুদীর্ঘ পথের ওপর আমারই চরণ চিহ্ন সবার আগে মুদ্রিত হ'চ্ছে।

একটু রোদ উঠ্বার পর ময়ূর ময়ূরীর মেলা মিল্‌লো। মিঠে রোদে তাদের ঘুরে ফিরে নাচন। তার কত ভঙ্গিমা—

কখন যে ১২ মাইল পার হয়ে গেলাম তার কোনও খবরই

পেলাম না। মাইল পাথরের দিকে নজর পড়তেই দেখি খুরজা আর ৫ মাইল বাকি।

খুরজার (৮৭৯ মাইল) আসল নাম হচ্ছে খারিজা। কথাটা আরবী—মানে হচ্ছে নিষ্কর জমি। খুরজা খুব বড় বাজার। বেশীদিনের কথা নয় ৩০ বছর আগে এখান থেকে বছরে ৯০০০০ হাজার মণ তূলো বাইরে রপ্তানি হ'তো। এখান থেকে গম, অড়হর. ঘি, প্রচুর পরিমাণে কানপুর ও কলিকাতার বাজারে চালান হয়ে থাকে। মহাজনি কারবারটা পুরোপুরি চারুওয়াল বাণিয়াদের হাতে। এখানকার খেসগি পাঠানরাও ব্যবসায় কম নয়। খুরজাতে যদি দেখবার কিছু থাকে তবে একমাত্র পরেশনাথের মন্দির।

বেলা তিনটার সময় এখান থেকে মুলান্দ সহরের দিকে রওনা দিলাম। রাস্তার দু' ধারে দুরন্ত হনুমানের আড্ডা। আপন মনে পেয়ারা খেতে খেতে চলছিলাম—হঠাৎ এক বুড়ো হনুমান বন্ধুভাবে আমার হাতের পেয়ারাটী ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এটা যেন তাদের নিত্য প্রাপ্য। মতামতের কোন তোয়াক্কা তারা রাখে না।

পথিক একজন বললে, আমার খুব পুণ্যের জোর তা না হ'লে রামানুজ আমার হাত থেকে এ রকম ভাবে পেয়ারাটা কেড়ে নেবে কেন? মজা দেখবার জন্য বাকি পেয়ারা কটী তাদের

দিকে ছুঁড়ে দিলাম আর কোথায় যায়—দশ বারটা হনুমান এসে আমায় ঘিরে দাঁড়ালো—কাঙ্গালী বিদেয় করতেই হবে। পকেট ঝেড়ে দেখলাম আর একটীও নেই। তারা যে এ কথা মানতে মোটেই রাজি নয় তা ভেঙ্গচি কেটে জানিয়ে দিলে, সঙ্গী মশায় আর সইতে পারলেন না। তেলে মাজা লাঠিখানি উঠিয়ে দু'এক ঘা দেবার উপক্রম করতেই—সব সরে পড়লো। তারপর তিনি 'মহাবীরজীর' নামে দু'তিন বার জোড়হাতে প্রণাম করলেন—ওদের উপর লাঠি ওঠাবার পাপ থেকে মুক্তিলাভের জন্য।

দু'দিকে নিবিড় গাছের সারি শাখায় শাখায় কোলাকুলি—তারই জমাট ছাওয়ায় অন্ধকার উঁকি মারছে। এখানটা ভারি খারাপ। কয়েকদিন আগে নাকি এখানে ডাকাতি হ'য়ে গেছে। তাই পুলিশ পাহারা দিচ্ছে দেখ্‌লাম—এর পরেই (৮৯০) মাইল Lower Gangesএর উপর পুল। এর দু'মাইল পরে সহর—শাখা পথে যেতে হয়। G. T. Road খালের কিনারা দিয়ে চলে গেছে। সন্ধ্যে ৬টার সময় এখানে পৌছলাম। বাঙ্গালী Executive Engineer বাবুর (খোকা বাবুর) অতিথি হ'লাম।

সন্ধ্যের পর খোকাবাবুর সঙ্গে সহরের বিষয়ে আলোচনা কর্‌ছিলাম। কিন্তু একজন ভদ্রলোক, তাঁরই কেউ হবে, বিজ্ঞ-

দিকে ছুঁড়ে দিলাম আর কোথার যায়—দশ বারটা হনুমান এসে আমায় ঘিরে দাঁড়ালো—কাঙ্গালী বিদেয় করতেই হবে। পকেট ঝেড়ে দেখলাম আর একটীও নেই। তারা যে এ কথা মানতে মোটেই রাজি নয় তা ভেঙ্গচি কেটে জানিয়ে দিলে, সঙ্গী মশায় আর সইতে পারলেন না। তেলে মাজা লাঠিখানি উঠিয়ে দু'এক ঘা দেবার উপক্রম করতেই—সব সরে পড়লো। তারপর তিনি 'মহাবীরজীব্' নামে দু'তিন বার জোড়হাতে প্রণাম করলেন—ওদের উপর লাঠি ওঠাবার পাপ থেকে মুক্তিলাভের জন্য।

দু'দিকে নিবিড় গাছের সারি শাথায় শাথায় কোলাকুলি—তারই জমাট ছাওয়ায় অন্ধকার উঁকি মারছে। এখানটা ভারি খারাপ। কয়েকদিন আগে নাকি এখানে ডাকাতি হ'য়ে গেছে। তাই পুলিশ পাহারা দিচ্ছে দেখ্‌লাম—এর পরেই (৮৯০) মাইল Lower Gangesএর উপর পুল। এর দু'মাইল পরে সহর—শাখা পথে যেতে হয়। G. T. Road খালের কিনারা দিয়ে চলে গেছে। সন্ধ্যে ৬টার সময় এখানে পৌছলাম। বাঙ্গালী Executive Engineer বাবুর (খোকা বাবুর) অতিথি হ'লাম।

সন্ধ্যের পর খোকাবাবুর সঙ্গে সহরের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। কিন্তু একজন ভদ্রলোক, তাঁরই কেউ হবে, বিজ্ঞ

করা হল। "উঁচা নগর" কথা পার্শি ভাষায় "বুলান্দ সহর"। নিতান্ত আধুনিক বাড়ী, পার্ক, স্নানের ঘাট ছাড়া বিশেষ দেখবার মত কিছুই নেই।

এখানকার ব্রাহ্মণরা বলেন তাঁরা গৌড়ীয়। তাঁরা নাকি জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের সময় এ দেশে আসেন—আর সেই থেকেই এখানে তাঁদের বসবাস। কিন্তু একথা সত্যি নয়—কেন না সর্পযজ্ঞের পর গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ দেশে ফিরে গিয়েছিলেন।

বুলান্দসহরে একটা প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল। একদম বাজে—কতকগুলি চাঁদনীর দোকানের আমদানী ছাড়া আর কিছুই তাতে ছিল না।

১৪ ফেব্রুয়ারী ২৪

দিল্লী এখান থেকে ৩৮ মাইল দূরে। তাই ঠিক করলাম দিল্লীই যাবো। এখান থেকে একটা রাস্তা মিরাট চলে গেছে। মাইল খানেক পরে আবার Lower Ganges Canal (৮৯৩ মাইল) পার হলাম। বেলা ১০টার সময় সেকান্দ্রাবাদে পৌঁছিলাম। একজন হিন্দু ভদ্রলোক তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রুটি তরকারী খাইয়ে দিলেন। পুরাণো সড়ক (G. T. Road) সেকান্দ্রাবাদ থেকে সোজা খুরজায় চলে গেছে। তবে আজকাল তত যাতায়াত নেই বলে—সড়কের

অবস্থা বড় শোচনীয়। পাগড়ীর কাপড়, এবং সংস্কৃত পঞ্জিকার জন্য সেকান্দ্রাবাদের কিছু নাম ডাক আছে।

কর্ণেল স্কিনার আলিগড় যুদ্ধের পর বার হাজার ঘোড় সওয়ার নিয়ে এখানে আড্ডা গাড়েন, যাতে দিল্লী আলিগড় সড়কের উপর কোনও উপদ্রব না ঘটে। মারাঠা জায়গিরদার মালাগর তাঁকে পাত্‌তাড়ি গুটোতে বল্‌লেন। স্কিনার তা শুন্‌তে আদৌ রাজি হলেন না, কাজেই দু'দলে ঠোকাঠুকি হ'লো—তাতে অবশ্য জিতলেন স্কিনারই।

সেকান্দ্রাবাদ থেকে যখন গাজিয়াবাদে এলাম তখন দিনের আলো নিভে গেছে।

এখান থেকে দিল্লীর দূরত্ব ১০ মাইল। ৯২৩মাইলে হিন্দন নদী পার হলাম। সন্ধ্যে হ'তেই যে যার ঘরে চলে গেছে—নির্জ্জন পথে শুধু আমিই একা। আঁধারে কত মাইল চলা হ'লো—কত মাইল বাকি আছে—কিছুই বোঝবার যো নেই। চলতে চলতে পায় পাথর লেগে চোট পেলাম। তাইতো রাস্তার উপর পাথর—চোখে দেখি একটা মাইল ষ্টোন। বুঝতে পারলাম অন্যমনস্ক হয়ে চল্‌তে চল্‌তে একবারে রাস্তার ধারে এসে পড়েছি—আর একটু হ'লে ১০।১২ হাত নীচে গড়িয়ে পড়তে হ'তো।

মাইল পাথরের উপর আঙ্গুল বুলিয়ে বুঝতে পারলাম দিল্লী

আর ছয় মাইল বাকী। কিছু বাদে Eastern Jumna Canal পার হতে হ'লো। দিল্লীর মাইল চারেক দূর থেকে G. T. Roadএর পাশাপাশি আর একটী রাস্তা দিল্লীর দিকে চলেছে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মোটর ছাড়া অন্য যান বাহনের চলা নিষেধ। আর এক্কার ভঙ্গীময়ী নৃত্যগতি, গরুর গাড়ীর রাগ রাগিণী, লরীর পাঁজর পেশা চাপ—সব সইতে হবে এই গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডকে। যে বড় তাকে চিরদিনই সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে হয়—দুনিয়ার হালই এই। প্রায় রাত ৯½ টার সময় যমুনা পুলের গেটে এলাম। দু'জন পুলিশ প্রহরী পাহারার নামে অষ্টরম্ভা দেখিয়ে আগুনের আরাম পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করছিল। এটা আমার বেশ জানা ছিল—যদি তাদের দৃষ্টি গণ্ডিতে পড়ি তবে আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যমুনার ঠাণ্ডা হাওয়া খেতে হবে। এত রাতে বাঙ্গালীর ছেলে দিল্লীর দিকে চল্‌ছে—নিশ্চয় কিছু মতলব আছে—এ রকম একটা কিছু তারা আবিষ্কার কোরে ফেলতো—তাই চুপ করে পুলের ভিতর ঢুকে পড়লাম। ওপারের পুলিশ প্রহরী কিছু খেয়ালই করলে না, কেন না তাদের অপর প্রান্তের বন্ধুরাই ত আমাকে "পাশ" করেছে। ফোর্টের উঁচু প্রাচীরের পাশ ঘেঁসে রাস্তা।

কড়া নাড়ানাড়ির পর সাড়া পেলাম—প্রাণ ঠাণ্ডা হো'ল, রাসবিহারী বাবু বেরিয়ে এলেন। তাঁকে পরিচয় পত্র দেখালাম।

তিনি আমার সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করলেন। ইনি Sen & Coর পরিচালক—ফোয়ারার কাছে থাকেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ২৪

সকাল বেলা রাণীবাগ এ (Queen's Garden) বেড়াতে গেলাম। খুব বড় বাগান—দিব্যি সাজান।

ফোয়ারার পাশেই সোণারি মস্‌জিদ। এর গম্বুজগুলি সোণালি রং করা তামার পাতে মোড়া। সে রকম কোনও বিশেষত্ব নেই। যখন দিল্লীর বুকে রক্তের দরিয়া বয়ে যাচ্ছিল—তখন নাদির এখানে কয়েক ঘণ্টার জন্য বসেছিলেন। তার নীচে বসেছিলেন মির্জ্জামেদী (নাদির সার হাকিম) তিনি মন্ত্রীবর আসফজার কথায় গলে গিয়ে বিনীতভাবে নাদিরসাকে জানালেন "হিন্দুস্থানের উজির উষ্ণীষ বিহীন শিরে, চোখের জলে ভেসে, কাতরভাবে আপনার কাছে নিবেদন করছেন, আপনার বিজয়ী সৈন্যেরা রক্তেই হাত রঞ্জিত করবেকি—জলে কি আর হাত পরিষ্কার করবে না" ?

নাদির সা উত্তর করলেন "থাক আর না। আমি ক্ষমা করলাম।" দিল্লী তখন লক্ষ লোকের প্রাণহীন দেহে মহা-শ্মশানে পরিণত।

খেয়ে দেয়ে ফোর্ট দেখ্‌তে গেলাম। দু'আনা দর্শনী দিতে

হ'লো। লালখানা তোরণ পার হয়ে সাজাহানের প্রাসাদের সামনে এলাম।

মোগল বাদসাদের সময় লালখানা তোরণের নীচে দিয়ে সাহজাদা ছাড়া অন্য কেউ হাতী, ঘোড়া, কিম্বা অন্য কিছু চড়ে আসতে পারতো না—সকলকেই চরণ রথের-রথী হ'তে হতো।

দেওয়ানী আম (Hall of Public Audience) স্থাপত্য বিদ্যার উৎকর্ষতার পরিচায়ক। রক্ত প্রস্তরের স্তম্ভশ্রেণীর উপর খিলানের ছাদ অপূর্ব্ব-কৌশলে নির্ম্মিত। তিন দিক খোলা—মাঝখানে শ্বেত পাথরের চাঁদোয়ার নীচে বাদসার বসবার জন্য শ্বেত পাথরের সিংহাসন। সিংহাসনের চার কোণে স্তম্ভের গায় কত লতাপাতা আঁকা—আগে এর ওপর হীরা চুণি মতি মণি বসান ছিল। আজ তার জায়গায় নকল কাচের আমদানী। সিংহাসনের নীচে মর্ম্মরবেদী। উজির সাহেব তাতে বসে জরুরি চিঠিগুলি সোণার থালায় বাদসার হাতে দিতেন। আশেপাশে বসতেন আমীর ওঁমরাও—সব উঁচুদরের লোক। সিংহাসনের পেছনে দেওয়াল। তার গায়ে চমৎকার ছবি আঁকা—একদম নিপুণ হাতে নিখুঁত নকসা।

দেওয়ানী খাসের (Hall of Private Audience) গঠন সৌন্দর্য্য এবং কারুকার্য্য দেখে অবাক্ হতে হয়। ফার্গুসনের

মতে এ দুটি "gems of the palaces"। চিত্র বৈচিত্র্যে, সুন্দর ভাবে অলঙ্কৃত। তিন দিক খোলা, যমুনার দিকে শ্বেত পাথরের জালিকাটা পর্দ্দা। উপরি ভাগ সোনা রূপায় আবরিত ছিল; এর জন্য খরচ হয়েছিল ৩৯ লাখ টাকা। কিন্তু সে সুন্দর বেশ আর নাই—হিন্দু যুবতী বিধবার মত নিতান্ত নিরাভরণা।

একদিন ময়ূর সিংহাসন—জগৎ জুড়ে যার খ্যাতি ছড়ান—এই খানেই মর্ম্মরবেদীর উপর অবস্থিত ছিল। নাদির সার অনুগ্রহে সে মর্ম্মরবেদী আজ শূন্য পড়ে।

সোণার বদলে এখন পিতলের ফলকে কর্নিসের গায়ে লেখা আছে—

"আগার ফিরদৌস বা রুয়ে জমিনাস্ত
হামিনাস্তা হামিনাস্তা হামিনাস্ত।

পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তা এইখানেই, তা এই খানেই, তা এইখানেই।

দেওয়ানী খাসের উত্তরে 'হামাম' বা স্নানাগার। পাথর কেটে পদ্মফোটান, তার ভিতর থেকে সুরভি মাখা জলের ফোয়ারা উঠ্‌তো। পাথরের জলাধার কোনটিতে গোলাপ ভেজান শীতল জল—কোনটিতে বা গরম জল ভরা থাক্‌তো। মর্ম্মর পথে যমুনার পূত বারি মেজের উপর দিয়ে বয়ে যেত। যমুনার সে স্রোত অনেকদিন হ'লো শুকিয়ে গেছে। মতি

মস্‌জিদ ছোট হলেও দেখতে বেশ—শ্বেত পাথরের ওপর কাজ করা। আওরাংজেব পুর-মহিলাদের নমাজ পড়বার জন্য এ মস্‌জিদটী নির্ম্মাণ করিয়ে দেন।

জুম্মা মস্‌জিদ ১৬৫০ সালে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাজাহান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। হিন্দু বলে প্রবেশের জন্যে পাশের দরকার হ'লো। তিন দিকে, উত্তর দক্ষিণ এবং পূবে, তিনটী প্রকাণ্ড বড় গেট। উত্তর গেট দিয়ে ৩৯টা সিঁড়ি পার হয়ে বিস্তৃত প্রাঙ্গনে এলাম—সে এক বিরাট ব্যাপার, এত লোককে একসঙ্গে নমাজ পড়তে আমি কোনও দিন দেখিনি। ধনী গরীব সবাই লাইনের পর লাইন করে দাঁড়িয়েছে। উঠা বসা সব এক সঙ্গে—যেন মিলিটারী ডিসিপ্লিন। মস্‌জিদের মেঝেতে শাদা কালো মার্ব্বেল পাথরের টুকরার উপর কালো হরফে লেখা আছে 'পথপ্রদর্শক'। কথা দুটী কি গভীর অর্থ না প্রকাশ করে! দক্ষিণ পশ্চিম কোণে হজরত মহম্মদের দু'একটী পবিত্র চিহ্ন যত্ন করে রাখা আছে। সেখানে মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ যেতে পারে না। বড় বড় গম্বুজগুলি মস্‌জিদের গাম্ভীর্য্য যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে। মিনার দুটী ১৩০ ফিট। মিনারের উপর থেকে দিল্লী বেশ দেখতে।

দিল্লী তোরণের বাইরে অনেক স্তম্ভ। ৪৩ ফুট উঁচু। এত মসৃণ যে কিসের তৈরী, পাথর কি ধাতুর, ধরতে পারা

যায় না। স্তম্ভটী প্রথমে মিরাটে ছিল সেখান থেকে ফিরোজ সা ১৩৫৬ সালে তুলে এনে এখানে তাঁর রাজধানী খুস্কে স্থাপন করলেন। তখন মিনারা-ই জারিণ (সোণার থাম) নামে সকলের কাছে পরিচিত ছিল। পাণ্ডবদের পুরাণো কেল্লায় চট্ করে এক চক্র মারলাম। এর আর এক নাম "দিনপানা"। হুমায়ুন নাকি মহরম মাসে মোল্লা ফকীর নিয়ে নমাজ পড়ে এখানে ভাবী কেল্লার ভিত্তি পাথর স্থাপন করেন। তারপর বছর না ঘুরতেই 'দিনপানা' তৈরি হয়ে গেল। তারপর পুরাণো কেল্লায় 'সেরগড়' 'সেরমঞ্জিল' 'তল্লাক গেট' প্রভৃতি দেখে নিলাম।

নিজাম উদ্দিনের কবর। তিনি খুব বড় ফকীর ছিলেন। জালালউদ্দিন খিলজির কবে কবর হবে একথা তিনি অনেক দিন আগেই বলে রেখেছিলেন। "দিল্লী হানাজ দুরান্ত" —দিল্লী এখনও অনেক দূর—তাঁরই কথা হাতে হাতে ফল দেখিয়ে দিল যখন তোগলক সা দিল্লীর কাছে এসেও দিল্লীতে আসতে পারলেন না—৪ মাইল দূরে আফগানপুরে হঠাৎ মারা গেলেন। আলাউদ্দিন খিলজির সময় যখন মোগলরা লুটপাঠ করতে এদেশে আসে তখন তিনি মন্ত্র পড়ে তাহাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আরও কত কি। নিজাম উদ্দিনের কবর মুসলমানদের কাছে খুব পবিত্র। নিজামউদ্দিনের সমাধি

মন্দিরের প্রাঙ্গনে আরও অনেকগুলি কবর আছে। জাহানারা, মহম্মদ সা, মির্জ্জাজাহাঙ্গীর এখানেই চিরদিনের জন্য শায়িত। এঁদের তিনজনের জীবনী, মোগল রাজত্বের তিনখানি ছবি। জাহানারার সমাধি-স্মৃতি খুব ছোট হ'লেও পবিত্রতার নিদর্শন। কবরের চারপাশে জালিকাটা শ্বেত পাথরের দেওয়াল ঘেরা—তাতে মাত্র একটী দরজা। জাহানারার কবর তাঁর কথামত ঘাসে ঢাকা। কবরের পাশে শ্বেত পাথরে লেখা আছে :—

"বেগায়র্ সাবজা না পোশাদ কাসে মাজারে মারা।
কে কব্‌ব পোশী গঁরিবাঁ হামি গিয়াব সান্ত।"

দামী আবরণ যেন আমার কবরের আভরণ না হয়, এ দীনা এ ক্ষণিকা জাহানারার কবর যেন সবুজেই (ঘাসে) ঢাকা থাকে।

নিজামউদ্দিনের বাউলি বা বড় কুঁয়া—এই কুঁয়ার জলে অনেক রকম রোগ নাকি সারে। দু'চার জন—মস্‌জিদের মাথা হতে, প্রায় ৭৫ ফুট উঁচু—জলের উপর লাফিয়ে পড়লো। একবারে ডুবলো নাকি? খানিক বাদে জল থেকে মাথা বের করে হাতখানি ছড়িয়ে দিলে কিছু বকশিষের জন্য। ভারি মজার দেখ্‌তে।

যমুনা তীরে হুমায়ুনের মাকবারা। দেখ্‌তে অনেকটা মর্ম্মরবিলাপ তাজের মত। হুমায়ুন নমাজের 'আজান'ধ্বনি

শুনে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে লাইব্রেরীর মার্ব্বেল সিঁড়িতে পা পিছ্‌লে মারা যান। হাজিবেগম (হামিদাবানু) তাঁর স্বামীর পবিত্র স্মৃতির উপর এই সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। নির্ম্মাণ করতে সময় লেগেছিল ১৪ বৎসর, আর খরচ হয়েছিল ১৫ লাখ টাকা।

এখান থেকে মাইল পাঁচেক পরে কুতুবমিনার। কুতুব মিনারের পাঁচটী তলা। প্রথম অংশ ঢেউ খেলান ও কোণকরা দ্বিতীয় অংশ শুধু ঢেউ খেলান খাঁজকাটা। তৃতীয় অংশের খাঁজগুলি সকোন। তার পরের দু'অংশ সাদাসিদে ধরণের। প্রথম তিন অংশ লাল পাথরের ও উপরের দুই অংশ সাদা পাথরের তৈরি। প্রত্যেক তলা ঘিরে গোল বারাণ্ডা। কুতুবের গায়ে কোরাণের বয়ান, আল্লার এক কম শত নাম, ফিরোজসার যশোগাথা, আরও কত কি লেখা। কথিত আছে—পৃথীরাজের কন্যা মিনারের উপর হতে সূর্য্যদেবের পূজো করতেন।

কুতুব ২৪২ ফিট উঁচু। ৩৮০টী ঘুরান ফিরান সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম—কি চমৎকার বাতাস, সমস্ত অবসাদ দূর করে নিল। কত শতাব্দী পার হয়ে গেছে কুতুবের উপর দিয়ে—কত কালের পুরাণো! 'চৌহান কুলরবি পৃথ্বীরাজের শেষ যুদ্ধ যাত্রা, মোগল পাঠানের উত্থান পতন, দিল্লীর মসনদের জন্য কাটাকাটি, কত উৎসব রজনীতে নগরীর সে বেশভূষা

কত না দেখেছে। আজ সে সব কিছুই নেই, হিন্দুস্থানের সে গৌরব আজ কোথায় মিলিয়ে গেছে—পড়ে আছে শুধু সুদূর অতীতের স্মৃতির বেদনা পাষাণের কোণে কোণে।

যোগমায়ার মন্দির, যাঁর আরাধনা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ করেছিলেন, কুতুবের সামনেই অবস্থিত। এর কাছেই 'লোহা কি লাট' দাঁড়িয়ে আছে। শোনা যায় অনঙ্গপাল মমুসলমাদের হাত থেকে রাজ্য বাঁচাবার জন্য পণ্ডিতদের উপদেশ নিয়ে এই লৌহ স্তম্ভ প্রোথিত করলেন, তলদেশ পাতালে গিয়ে বাসুকীর মাথায় ঠেক্‌কো। সত্যি সত্যি বাসুকীর ফণার উপর বসান হয়েছে কি না দেখবার জন্য আবার তুলে ফেল্‌লেন। বাসুকীর রক্ত পাতাল থেকে ছুটে বেরুল, সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিও এলো "এইবারেই তোমার পতন হবে।" তারপর কত চেষ্টা করলে আগের মত দৃঢ় করে বসাবার জন্য কিন্তু সে রকম আর হ'লো না—ঢিলে হয়ে রইলো।

'কিল্লিতো ঢিল্লি ভই
তোমার মত্ ভয় হিন।

তোমার বাসনা পূর্ণ হ'লো না—কিল্লি তো ঢিলে হয়ে রইল। কেহ কেহ বলেন, এই 'ঢিল্লি' থেকেই দিল্লী নামের উৎপত্তি।

ফিরবার পথে ফেরোজ সা, সাফদর জঙ্গের সমাধি-মন্দির

ও জয়সিংহের 'যন্তর মন্তর' তাড়াতাড়ি করে দেখে নিলাম।

সহরের মধ্যে ক্লক টাওয়ারের কাছে যখন এলাম তখন চাঁদনী চক্ আলোয় ভরে গেছে। রাস্তার ধারে ধারে নানান্ জিনিসের দোকান সুন্দর ভাবে সাজান। খরিদ্দারের কেনাকাটায় বাজারটা সজীব করে রেখেছে, আবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে নবাবী চালে কেউ বা খানিক খোসগল্প করছে। তাদের বুলি বেশ মিঠে—আদব কায়দা ভারি মোলায়েম। সময়ের মূল্য যেন তাদের কাছে নেহাৎ হাল্কা!

১৮ই ফেব্রুয়ারী ২৪।

দিল্লী থেকে মাইল গোনা নূতন করে স্থুরু হ'লো। ইচ্ছে করছিল দু' দশ দিন খুব করে ঘুমিয়ে নিই তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে—কিন্তু উপায় নেই, না হাঁটলেই পা বেদনা করবে। অগত্যা অতিকষ্টে দিল্লীর লাড্ডুর লোভ সামলিয়ে দিল্লী থেকে রওনা দিলাম। এমনি ঢিমে তেতালায় চলা, যে ১২ মাইল না ফুরোতেই বেলা শেষ হয়ে এলো। এলাম আলিপুরায়।

ইচ্ছে ছিল আলিপুরাতেই কোন রকমে রাত কাটাব—কিন্তু এ সাধেও বিধি বাম হ'লেন! আলিপুরার থানাদার সাহেবের নেক্ নজরে পড়ে গেলাম। পুলিশ পাঠিয়ে পরদেশীর উপর তলব করা হ'লো। দু'চারটা সওয়াল জবাবের পর হুকুম হ'লো আলিপুরা থেকে অন্য কোথায় যাবার জন্য যে হেতু এখানকার Encamping groundএ একদল ইংরেজ সেনা ক্যাম্প খাটিয়েছে, সেই হেতু কোনও বিদেশীকে থাকতে দেওয়া যেতে পারে না। হুকুম তামিল করলাম—পথের পথিক আবার পথেরই উপর দিয়ে চলতে লাগলাম। গ্রাম আর চোখে পড়ে না—নেহাৎ বরাৎ জোর রাস্তায় একটা লোক জুটলো,, সে যাচ্ছে

নারেলায়। নারেলা G. T. Road থেকে ১২ মাইল তফাতে। তারই অনুগমন করলাম। রাত ৮টার সময় নারেলায় পৌঁছলাম। আজকের দিনে মোট চলা হ'লো ২২ মাইল।

সাফাখানার (হাঁসপাতালের) ডাক্তার বাবুর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে, তূলোর বালাপোশ মুড়ি দিয়ে কি জানি কি কথা ভাবছিলেন। হঠাৎ আমার আবির্ভাবে চম্‌কে উঠলেন। সব কথা বলতেই তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। ডাক্তারের কর্ত্তব্য তিনি ভুলে যাননি—তাই দু' এক ঘণ্টা ধরে এ বেচারার উপর লম্বা এক লেক্‌চার ঝাড়লেন · এ রকম ভাবে চললে পরে নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্, প্লেগ (পাঞ্জাবে তখন প্লেগের মরসুম) হুক-ওয়ারম্ (খালি পায়ে চলার দরুণ)··· আরও কত কি রোগ আমাকে আক্রমণ করতে পারে। যা বল্‌লেন সবই নীরবে মেনে নিলাম—তা না হলে লেক্‌চার খতম হতে দেরী হবে—ফলে ঘুমোতেও রাত হবে বেশী।

১৯ ফেব্রুয়ারী ২৪

সকাল বেলা নারেলা গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামের প্রাচীনের দল আমাকে ঘিরে ধরলো মহাত্মাজীর চেলা মনে করে। আমি "না" বল্‌লেও তারা শুন্‌বে না। তাদের

যত দুঃখের পাঁচালী ধৈর্য্য ধরে শুন্‌তে হ'লো। যা হোক্, তার পুরস্কার পেলাম হাতে হাতে—পাকা একসেরী এক গ্লাসে গরম দুধ আমার জন্য হাজির করা হ'লা। দুধটাকে চিরকালই রোগীর পথ্য বলে মনে করে থাকি, তাই তত সুবিধা করতে পারলাম না। কম খাবার কারণ তারা বুঝে ফেল্‌লে, মহাত্মাজী যখন বল্‌তে গেলে কিছুই খান না তখন তার চেলা কম খাবে এতে আর বিচিত্রতা কি আছে।

নারেলা থেকে আঁকা বাঁকা গ্রামের পথ। মনসা কাঁটার ঝোপ চিরে বাবলা তলা দিয়ে সোণিপথের দিকে (সুবর্ণ পথ) চলে গেছে। সোণিপথ নারেলা থেকে মোটে ১১ মাইল। এখানে সরকারী ডাক্তার এস, মজুমদারের কাছে রইলাম। অনেকদিন কাগজ পড়িনি—তাই নূতন পুরাণো খবরের উপর চোখ বুলিয়ে নিলাম।

২০শে ফেব্রুয়ারী ২৪।

সোণিপথ থেকে G. T. Road ২ মাইল দূর। G. T. Roadএর উপর দিয়ে পাণিপথ চল্‌লাম। ২০ মাইল পথ পরে পাণিপথে পৌঁছলাম। আগে থেকেই জানা ছিল পাণিপথের Railway Hospitalএর ডাক্তার এবং কম্পাউণ্ডার উভয়েই বাঙ্গালী।

ডাক্তার বাবু কোথায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন, ছিলেন

তাঁর কম্পাউণ্ডার মশায়। বাড়ী বর্দ্ধমানে। তাঁর কাছে আশ্রয় চাইলাম—আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করবার জন্য তাঁকে ততটা মনোযোগী দেখা গেল না। আমিও সহজে ছাড়বো না—অনেক বিনীত নিবেদনের পর তাঁর মুখে কথা ফুট্‌লো। তিনি বললেন, ভারি মজার কথা, আপনি থাকৃতে চাইছেন—তা আর বেশী কি বলুন—কিন্তু ঘরগুলি ভারি নোংরা কোথায়ই বা থাকৃতে দেই—আর আপনি দু'টি খাবেন, সে ত আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় কিন্তু এখন ত আর কিছু করতে পারছি না, আপনি কাল আসবেন, আমি সব ঠিক করে দেব বুঝলেন না?" আর কিছু না বুঝলেও এ পর্য্যন্ত বুঝলাম, থাকৃতে দেবার ইচ্ছে মোটেই নেই। মনটা ভারি দমে গেল, বাংলার বাইরে বাঙ্গালীর জন্য বাঙ্গালীর সহানুভূতির অভাব দেখে!

সোজা Assistant Station masterএর কাছে গিয়ে খেতে চাইলাম—তিনি বাঙ্গালী ডাক্তার এবং কম্পাউণ্ডার যুগলের কথা উল্লেখ করলেন। বল্‌তে ভারি লজ্জা হচ্ছিল যে তাঁদেরই একজনের কাছ থেকে বিতাড়িত। তাই বল্‌লাম "শুনেছি পাঞ্জাবীরা খুব অতিথি সৎকার করে—আপনি হ'লেন পাঞ্জাবী; যদি বাঙ্গালীদেরই কেবল অতিথি হই তবে ত আপনাদের পরখ্ করবার ফুরসৎ পাবো না, তার জন্যই আপনার কাছে আসা... ।"

তিনি উত্তর করলেন "বেশক্—আপনার আরামের সমস্ত ইন্তেযাম করে দিচ্ছি—আপনি একটু বসুন"।

তারপর আর একটুও কষ্ট পেতে হ'লো না।

২১শে ফেব্রুয়ারী ২৪

পঞ্চপাণ্ডবদের পঞ্চ প্রস্থের এক প্রস্থ এই পাণিপথ। এখানেই আবার ভারতের ভাগ্য তিন চারি বার ধরে যাচাই করা হয়। ফকির কালন্দরের কবর, বাবরের কাবুলি মসজিদ দেখে নিলাম।

কালন্দর ছিলেন খুব বড় একজন ফকির। তাঁর সম্বন্ধে আজব কথা সব শোনা যায়। একদিন কালন্দর যমুনার জলে দাঁড়িয়ে ওজু করছিলেন, ঠাণ্ডা জলে তাঁর পা অবশ হয়ে এলো, তিনি নড়তে আর বল পেলেন না। যমুনাকে হুকুম করলেন সাত পা পিছিয়ে যাবার জন্য। যমুনা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সাত মাইল জমি পিছিয়ে গেল। কর্ণালে ও বুধা-খেরাতে কালন্দরের আরও তুটী কবর আছে। তিনি নাকি একই সময়ে এ তিন জায়গায় দেহত্যাগ করেন, তাঁর প্রিয় শিষ্যদের খুসী করবার জন্যে। গড়-ই-সাহিদানে ইব্রাহিম লোদীর কবর। তিনি পানিপথের পহেলা লড়াইয়ে বাবরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে বীরের মত প্রাণত্যাগ করেন। পানিপথের খোলা ময়দানে তাঁর রক্তমাখা বরফের মত ঠাণ্ডা দেহখানি ছ'হাজার

মরা সৈন্যের ভিতর কোথায় লুকিয়েছিল। খুজে খুজে তাকে বের করা হ'লো। বিজয়ী বাবর তাঁকে দস্তর মত সম্মান দেখালেন। তারপর তাঁকে শান্তিময় কবরের কোলে চিরদিনের জন্য শয়ন করান হলো।

কেমনতর একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল, তাই রেল লাইন ধরে কর্ণালের দিকে চলতে লাগলাম। সন্ধ্যের কিছু পরে কর্ণাল ষ্টেশনের distant signalএর কাছে এলাম। Pointsman বললে, এখান থেকে কর্ণাল সহর কাছে হবে। একটা মস্ত বড় বিল—তার কিনারা দিয়ে যেতে যেতে কাদায় পা বসে গেল, কোনও রকমে খালাস পেলাম। সামনে একটা খাল পড়লো, বেশ করে কাদা ধূলি ধুয়ে নিলাম। গরুর গাড়ীর চাকার অস্পষ্ট দাগ দেখে পথ খুঁজে নিলাম। ঝোপ ঝাড়ের পাশ কেটে চল্‌তে লাগলাম। কম্বলটা একটা গাছে আটকে গেল; টানাটানিতে অনেকখানি ছিঁড়েও গেল, টানাটানিতে ঝোপের ভিতর থেকে পাখীগুলো ভয়ে ডেকে উঠ্‌লো—তাইতো এলাম কোথা! সামনে কতকগুলি উঁচু গাছ সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে—বোধহয় একটা বাগান গোছের কিছু হবে। তার ভিতর দিয়ে চলতে গিয়ে একটা শক্ত ডালের গায়ে ধাক্কা লেগে কপালখানা ফুলে উঠ্‌লো—তখন যত রাগ হ'লো ঐ pointsmanটার উপর। প্রায় এক ঘণ্টার উপর ঘুরে ঘুরে মরলাম, তবুও সহরে যেতে

পারলাম না, ভারি ভাবনা হ'লো তাইতো এলাম কোথা? দূরে দেখ্‌লাম আগুণ জ্বল্‌ছে। ভাবলাম হয়তো বা আমারই মত কেউ আগুণ জ্বালিয়ে রুটি তৈরি কর্‌ছে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি—এযে চিতার আগুণ! কোথায় সহরে যাবো, এলাম শ্মশানে! সাহসে ভর করে চিতার আগুণের পাশে কম্বলটা বিছিয়ে বসে পড়লাম। সামনে দেখি অন্ধকারের গায়ে একটা কালো ছায়া ক্রমেই আমার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। ভূতের ভয়ে প্রাণ জড়সড়, শরীরের রক্ত হিম হয়ে এলো, ছায়াটা ক্রমেই এগিয়ে আমার কাছে এলো হাত নেড়ে আমাকে ডাক্‌লে—আবার কাছে এলো, আবার হাত নেড়ে ডাক্‌লে—তারপর দূরে সরে গেল। এম্নি ভাবে তিন চার বার ধরে অভিনয় চললো। তার অনুসরণ কর্‌লাম। ক্রমশঃ যেতে যেতে মিনিট দশেক পরে কর্ণাল সহরের গেটের কাছে আমাকে এনে হাজির করলে—তারপর সে চট্‌ করে কোথায় মিশিয়ে গেল আর পাত্তা পাওয়া গেল না। সহরের ভিতর ২।৪ জন লোককে ব্যাপারখানা বল্‌লাম। তারা বললে যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ শ্মশানে এম্নিধারা একটা ভূত দেখে থাকে বটে, কিন্তু কোনদিনও কারও অনিষ্ট ঘটেনি। চ্যাটার্জ্জি মশায়ের অতিথি হলাম। খেয়ে দেয়ে যখন শুই তখন বাজলো ৯॥ টা।

২২শে ফেব্রুয়ারী ২৪

কর্ণাল সহর ১২ ফিট উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সরু সরু উঁচু নীচু গলি, বাড়ীগুলি পুরাণো ধরণের, গায়ে গায়ে লাগা-লাগি, আলো বাতাসের পথ একেবারে রুদ্ধ। পাঞ্জাবের প্রায় সব সহরই এই রকম। কর্ণাল দাতাকর্ণের রাজধানী। সহরের বাইরে পথে একটী প্রাচীন জলাশয় দেখলাম। এখানকার লোকের কাছে এটা "করন্‌কা তলাও" (কর্ণের পুকুর) নামে পরিচিত। তার চার পাশ বাঁধান কিন্তু জল ভারি অপরিষ্কার।

পিপলি কর্ণাল থেকে ২১ মাইল দূর। পথের ধারে অবারিত গমের ক্ষেত্র। নিবিড় নীল আকাশের কোলে বাতাসের মৃদুল পরশে দূর দিগন্তে মেলা সবুজের বুক পুলকে দুলে দুলে উঠ্‌ছে। পাঞ্জাবী চাষা সে কেবলই খাট্‌ছে। মাঝে মাঝে ক্ষেতের দিকে চেয়ে দেখছে—মেহনত সফল হ'লো কি না। ক্ষেতের ভিতর থেকে কৃষক বধূ আগাছাগুলি বেছে ফেলছে। রোদে তার সারা মুখখানি রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। গমের চারাগুলির আড়ালে তার মুখের খানিকটা ঢাকা পড়েছে,—

"Like a voilet by a mossy rock
half hidden from the eye."

এরা এত পরিশ্রম করে যে তা দেখলে অবাক হতে হয়। সারাটী বছর ক্ষেতের পেছনে লেগেই আছে! আমাদের দেশের

কৃষকদের মত এরা কুঁড়ে নয় কিম্বা তাদের মত এরা আধ ন্যাংটা বা আধপেটা নয়। দস্তুর মত খেয়ে পরে সুখে কালকাটায়। পাঞ্জাবী চাষাদের বলে "জমিদার"। ৮৭ মাইলে ভূতানা ছাড়িয়ে পিপলি (দিল্লী থেকে ৯৫ মাইল) এলাম। এখানে অনন্তপ্রসাদ শ্রীবস্ত্র মহাশয়ের আথিতিয়েতা লাভে বঞ্চিত হ'লাম না। কুরুক্ষেত্র পিপলির দু'মাইল দক্ষিণে। পিপলিতে রতন যখ (যক্ষরত্ন) তীর্থ বর্ত্তমান!

সাহাবাদে বেলা ১১টার সময় পৌঁছলাম। পৌরাণিক সরস্বতী পার হতে হয়েছিল। সাহাবাদে ডাক্তার বাবুর অনুরোধে সেদিনটা সেখানেই কাটাতে হ'লো। বৈকাল বেলা মস্তগড় দেখে নিতে ভুল্‌লাম না। মস্তগড় আগে ছিল মস্‌জিদ—এখন শিখদের ধর্ম্মের আস্তানা।

২৪শে ফেব্রুয়ারী ২৪

সাহাবাদ থেকে আম্বালা ছাউনি ১১ মাইল দূর। তঙ্গরী (১১৭) ও ওমলা (১১৮) নদী পার হ'লাম। N. W. রেলওয়ে লাইন ১১৯ মাইলে G. T. Road. উপর দিয়ে চলে গেছে। বেলা ন'টার সময় আম্বালা ছাউনিতে পৌঁছলাম।

ডাক্তার মুখার্জ্জি আম্বালার মধ্যে বড় ডাক্তার। তাঁর কাছে হাজির হ'লাম; তখন তাঁর পাশে বসেছিলেন ডাক্তার এস্, বোস। মুখার্জ্জি মশায়কে বললাম, একটু থাকবার মত ব্যবস্থা

করে দিতে। আমার অনুরোধ তিনি নিতান্ত তাচ্ছিল্য করে ডাক্তার বোসের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। "Here is Dr. Bose your own countryman." বলে একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে নিলেন—আমি নিতান্ত ছেড়ে কথা কইতে পারি না, তাই শুনিয়ে দিলাম "So very kind of you indeed, to discover some pretex to escape my request. Many many thanks to you."

মনে করলাম ডাক্তার বোসও বোধহয় মুখার্জ্জির মত কিছু বল্‌বেন। কিন্তু সে রকম কিছু বল্‌লেন না বরং তাঁর বাড়ীতে আদর করে নিয়ে গেলেন। কথাবার্ত্তায় জানা গেল তাঁর বাড়ী ভরাকইয়ে। আমাদের বাড়ী লৌহজঙ্গে—পাশাপাশি গ্রাম। এ কথা ও কথায় আবিষ্কার করা হ'লো—গ্রাম্য সম্পর্কে তিনি আমার 'মামা' হন। ঠিক যেন পাথর খুঁজতে খুঁজতে পরশমণি পাওয়া—আমি যে খুব খুসী হয়েছিলাম তাতে আর কোনও ভুল নেই।

মামীমার স্নেহ এবং যত্নে সুদূর পাঞ্জাব প্রান্তে এসেও মনে হ'লো যেন বাংলা মায়ের কোলেই আছি। লক্ষ্মীনারায়ণ বর্ম্মা এল, এল, বি, এবং আম্বালা কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ এস, ভট্টাচার্য্যি আমার জন্য ২ খানি পরিচয় পত্র লিখে দিলেন।

আম্বালার কালীবাড়ী খুব প্রসিদ্ধ। শুনা যায় রামকৃষ্ণ

নামে একজন বিরাগী বাঙ্গালী তাঁর ভ্রমণকালে আগ্রা, দিল্লী, আম্বালা, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার প্রভৃতি সহরে—বিশেষ করে বাঙ্গালী ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্যে—কালীবাড়ী নির্ম্মাণ করেন।

বিদেশে অচেনা সহরে গেলে ভারি অসুবিধায় পড়তে হয়। কালীবাড়ী থাকার দরুণ সে সব অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। স্থানীয় বাঙ্গালীদের চাঁদার টাকায় কালীবাড়ীর খরচ চলে। প্রত্যেক কালীবাড়ীতে কালীদেবীর প্রতিমা আছে, তাঁর পূজা অর্চ্চনা রীতিমত বাঙ্গালী পূজারী দিয়ে করান হয়। আবার ছোট গল্পের মজলিস্ বসান, বাঙ্গালা বই কিম্বা দু'চার খানা সাময়িক পত্র পড়া, গান বাজনা করা সবই কালীবাড়ীতেই হয়ে থাকে।

২৭-২-২৪

সকালবেলা পালাবো মনে করছি, মাসীমা বললেন না খেয়ে যাওয়া বেজায় অসঙ্গত। তাঁর হুকুম অমান্য করবার মত কোনও ক্ষমতা আমার মধ্যে আদৌ প্রকাশ পেলো না। সময় কাটাবার অছিলায় ডাক্তারখানায় গেলাম। ডাক্তারবাবু নিউমোনিয়া রোগীর একটা নমুনা দেখালেন, যাকে দেখালেন সে ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিল। আচ্ছা করে কম্বল জড়াবার ফলে তার শরীরের স্থূলত্ব কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র,

এ ভিন্ন অন্য কিছু আমার চোখে পড়েনি। আমি যাবার পরই সে সেলাম ঠুকে ঘোড়ার পিঠে চেপে চলে গেল। ডাক্তারবাবু বললেন, তার নিউমোনিয়া হয়েছে—আপাততঃ বিমার হয়েছে বলে সে খুব কম দুধ খায়—মোটে রোজ তিন সের! ডাক্তার বাবু বল্‌লেন, এরকম কেস প্রায়ই পাওয়া যায়। আমার তো তাক্ লেগে গেল। নিউমোনিয়া রোগীর ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া-আসা, দু'তিনসের দুধে গলা ভিজানো, এত অত্যাচার করেও বেঁচে উঠে—নিতান্ত উড়িয়ে দেবার কথা নয়!

খেয়ে দেয়ে যখন বিদায় নিলাম তখন একটা বাজে। ভোজনের আধিক্য হেতু শরীর আলস্যে এলিয়ে পড়ছিল। দু'চার মাইল পুরো দমে চলতেই আলস্য একদম কেটে গেল। ২০৬ মাইলে ঘাঘর (দৃশদ্বতী) নদী। অঞ্জলী ভরে নদীর স্বচ্ছ শীতল জল পান করলাম। আর্য্যদিগের প্রথম বাসভূমির সীমানা ছিল পশ্চিমে দৃশদ্বতী এবং পূর্ব্বে সরস্বতী নদী। এই নদীর কুলেই একদিন আর্য্যগণ মধুরকণ্ঠে ভগবানের যশোগাথা গেয়েছিলেন, না জানি নদীর এই কুলুকুলু রজতধারায় সে লয়টুকু আজ বেজে উঠছে কিনা!

রাস্তার পাশাপাশি চলেছে N. W. রেল লাইন। উর্দ্দু জবান ক্রমশঃ বদলাতে শ্রেফ পাঞ্জাবী ভাষায় গিয়ে ঠেক্‌লো

তাতে আমার কোনও অসুবিধা ছিল না, আমারও কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন হচ্ছিলো। চলার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নূতনের আস্বাদন, হরেক রকম লোকের মেলামেশার সঙ্গে বিভিন্ন রকম আদব কায়দার বিনিময় করা, নূতন ছাঁচে কথা বলা—পথ চলার মজাই ওখানে। চিরদিনের জন্য যদি জীবনটাকে এম্নি ভাবে বইয়ে দিতে পারতাম—তবে কেমন চমৎকারই না হ'তো!

১৮ মাইলের পর রাজপুরাতে এলাম। একটা চিঠি ছিল সিরহিন্দ ষ্টেশন মাষ্টারের নামে, বুদ্ধি খরচ করে সেটা রাজপুরার ষ্টেশন মাষ্টারকে দেখালাম। তিনি কৃপা করে ওয়েটিং রুমে থাকবার অনুমতি দিলেন। অম্বলা থেকে আসবার সময় মামীমা পুঁটুলি ক'রে খাবার বেঁধে দিয়েছিলেন। ক্ষিদের তাড়নায় খাবারগুলিকে পুঁটলির নাগপাশ-বন্ধন মোচন করলাম—চোখের নিমেষেই সব সাবাড়! কিছুতেই ভাবতে পারলাম না যে এত খাবার এইটুকু সময়ের মধ্যে খেয়ে ফেলেছি! শূন্য পুঁটলির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম—আহা! যদি আরও কিছু থাকৃতো।

ওয়েটিং রুমে একজন পাদরী সাহেবেরও আগমন হয়েছিল। তিনি প্রথম খুব গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন, তারপর অল্পে অল্পে দু'এক কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—চা কেক পর্য্যন্ত

খাওয়ালেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত বেশ ভালই ছিলেন, আস্তে আস্তে উলুবনে মুক্তো ছড়াতে লাগলেন। You are very poor I see ; just become a christian brother and you will have enough of money, good wife every thing to make merry.

তাঁর কথার উপর জোর দিয়ে বল্‌লাম—"নিশ্চয়—আপাততঃ সাহেব তোমার কম্বলখানা দেও না, তোমার would be christian brother যে এখন কষ্ট পাচ্ছে।"

সাহেব একটু মিহি হাসি হেসে কম্বলখানা আমাকে দিলেন। কম্বলখানায় বেশ করে গা ঢেকে চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোবার আয়োজন করলাম। সাহেব তখন একধার থেকে বাজে বক্‌ছেন. সে সব শুনবার আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না।

রাত তখন ভোর হবে বোধ হয়, সাহেব ডেকে ওঠালেন—"চল, এখনই গাড়ি আসবে।" থাকৃতেই কথা হয়েছিল যে আমি তার সঙ্গে তাঁর আস্তানায় যাবো—সেখানে যা হয় আমার একটা বিহিত করা হবে। তাই তিনি বললেন "চল এখনই গাড়ি আসবে।"

তাইতো, সাহেব বড় জ্বালাতন আরম্ভ করলেন। 'সমস্ত রাত ধরে ভেবে ভেবে ঠিক করলাম আমি ক্রিশ্চান হতে

পারি না—ধন্যবাদ আপনার দয়ার জন্য"। বলে কম্বলখানি তাঁকে ফেরৎ দিলাম। সাহেব মুখ ভার করে প্লাটফরমে পায়চারি করতে লাগলেন।

২৮-২-২৪

রাজপুরা থেকে একটী রাস্তা পাতিয়ালা চলে গেছে—দূরত্ব ২৪ মাইল। সকালবেলা আবার চলতে লাগলাম, বেলা ১টার সময় সিরহিন্দে পৌঁছলাম। অনুরোধ পত্রের জোরে ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছ থেকে আদর পেলাম। সিরহিন্দ (সর-ই-হিন্দ) এক সময়ে হিন্দুস্থানের সীমানা ছিল। মামুদ কাবুল জয় করে সিরহিন্দ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন—তার এদিকেই ছিল হিন্দুরাজ্য—কাজেই তখন সিরহিন্দ হিন্দুস্থানের সীমান্ত সহর ছিল। আকবর সাহ থেকে আওরঙ্‌জেবের সময় পর্য্যন্ত সিরহিন্দের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। শিখদের কাছে সিরহিন্দের মত অপবিত্র সহর আর কোথাও নেই। এখানে গুরুগোবিন্দ সিংহের মাতা এবং পুত্রদের হত্যা করা হয়। বান্দা (১৭০৭ অব্দে) সিরহিন্দের নবাব উজিরখানের রক্তে তরবারি ধুয়ে সে অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের কতকটা প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। এখনও যদি কোন শিখ সিরহিন্দে আসে তবে যাবার সময় নিতান্তপক্ষে এক টুক্‌রো পাথর, না হয়তো একখণ্ড ইট নিয়ে বিয়াসের (বিপাশা) জলে বিসর্জ্জন দেয়।

এর অর্থ, এম্নিভাবে ইট পাথর নিতে নিতে একদিন না একদিন সিরহিন্দের শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত ধরণীর বুক থেকে মুছে যাবে।

সালাবত বেগের হাবেলী, পাতিয়ালা মহারাজের আমখাস, মিরমিরণের ও পীরবক্স নক্সাওয়ালার সমাধি-মন্দির দেখে নিলাম। পীরবক্স নক্সাওয়ালার সমাধি-মন্দির আমার চোখে ভাল লেগেছিল। পীরবক্স নিজে ছিলেন সুদক্ষ চিত্রকর। কবরের চারিদিকে চোখ জুড়ান নক্সা—চিত্রকরের সারাজীবনের স্বপ্ন যেন সত্য হয়ে ফুটেছে সমাধি-মন্দিরের গায়ে গায়ে!

২৯-২-২৪.

সিরহিন্দ থেকে ১১ মাইল পথ অতিক্রম করে খন্নায় এলাম। হাঁসপাতালের ডাক্তারবাবুর ছেলে শান্তপ্রসাদ কাপুর আমাকে ভারি খাতির করলেন। সন্ধ্যার সময় তাঁর সঙ্গে খন্নার এদিকে ওদিকে বেড়ালাম। একটা গ্রামেও গিয়েছিলাম। গ্রামের ঘরগুলি আগাগোড়া মাটি দিয়ে তৈরি—ছাদও তাই। বৃষ্টি খুব কম হয় বলে মাটির ছাদ টিকে থাকে—গর্ম্মীকালে ছাদের উপর তারা বিছানা পাড়ে। প্রত্যেক ঘরেই বোখারা (Fire place) আছে—শীতের রুদ্রতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

সন্ধ্যার পর খাবার ডাক্ পড়্লো। দরির (সতরঞ্চির) উপর বসে, ছোট মোড়ার উপর থালা রেখে খেতে আরম্ভ করলাম। আমাকেই সকলের আগে আহার করতে হ'লো, কেন না আমি

অতিথি—অতিথির পরিতৃপ্তির পর বাকী সকলে আহার করবেন। কি চমৎকার অতিথি সৎকার করে এই পাঞ্জাবীরা! এরা মনে করে—

অতিথি যস্মাৎ গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে
স তস্মৈ দুরাস্কৃতং দত্বা পূণ্যমাদায় গচ্ছতি।

সান্তারামের মা সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করছিলেন, "বাঙ্গালী, তুমি রাস্তায় কি খাও, রোজ তোমার খাওয়া জোটে কি? ঘর ছেড়ে আসাতে তোমার মনে খুব কষ্ট হচ্ছে—নয় কি?"

পাঞ্জাবী হিন্দু মহিলাদের হৃদয় ভারি কোমল—বাঙ্গালী মহিলাদের মত তাঁদেরও প্রাণ ভরা স্নেহ মমতা আছে। নীরসতা ও শুষ্কতার মাঝে মাঝে এই অজানা দেশে পল্লী-জননীর স্নেহ ও সহানুভূতি পেয়ে মায়ের কথাই থেকে থেকে মনে পড়্তে লাগলো—প্রাণ আনচান করে উঠ্লো, চোখের পাতা আপনা থেকেই জলের কণায় ভিজে গেল!

১-৩-২৪

আজ লুধিয়ানায় যাবো—২৬ মাইল পথ চল্‌তে হবে। শান্তপ্রসাদ লুধিয়ানা কলেজে পড়ে—বল্‌লে বিকাল বেলা সে ট্রেণে লুধিয়ানায় যাবে। সেখানে সে আমার জন্য Clock Towerএর কাছে অপেক্ষা করবে। তার কষ্ট স্বীকারের

ইচ্ছার জন্য তাকে ধন্যবাদ দিয়ে লুধিয়ানার দিকে রওনা হ'লাম। দু'ধারে খালি বালি—মাঝে মাঝে বালির ঢিপি—ছোট খাট মরুভূমির মতন। লু হাওয়া এক এক ঝলক আগুণ হানছিলো—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়ে দলে দলে হরিণ পার হয়ে গেল।

দু'এক যায়গায় দেখলাম উঠ দিয়ে লাঙল টানা হচ্ছে, পাতাল গভীর পাতকুঁয়ো থেকে জল চালান হচ্ছে জমির জন্যে। পিপাসা পেয়েছিল, চাষার কাছে জল চাইতেই সে চামড়ার ডোল থেকে জল ঢেলে দিলে পান করবার জন্য—সে জল ভারি ঠাণ্ডা আর খুব মিষ্টি। পাঁচ ছয় মাইল পর্য্যন্ত এ রকম দেখা যায়।

পথিক একজন জিজ্ঞাসা করলে "কিথে যানা প়াই" কোথায় যাওয়া হবে ভাই ?

"লুদ্দিয়ানা।"

দু'জনে কথায় কথায় বেশ চলতে লাগলাম। সে যখন শুনলে আমার বাড়ী ঢাকা, বাঙ্গালায়, তখন যাদু দেখবার জন্য সে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লো। ঢাকা সহর এদের কাছে যাদুর জন্য খুব মস্থর। এর কারণ আছে—শিষ্য সহ গুরু নানক বঙ্গদেশের অনেক স্থান ঘুরে ফিরে ঢাকা সহরে এলেন। মর্দ্দানা ছিল তার প্রিয় শিষ্য। ঢাকার এক ওস্তাদ যাদুকর তাকে ভেড়া বানিয়ে ফেললে। নানকদেব অবশ্য মন্ত্র বলে

মর্দ্দানাকে মানুষে পরিণত করলেন এবং সেই পাপিষ্ঠ যাদুকরকে সেই সঙ্গে ভেড়া বানিয়ে রাখতে ভুললেন না।

সে যাদু দেখবেই—কিছুতেই ছাড়বে না। চট্ করে পকেট থেকে একটা পয়সা বের করে আমার হাতে দিয়ে বল্‌লে "অন্ততঃ এটাকে উড়িয়ে দেও ত"।

আমি পয়সাটাকে হাতে নিয়ে অনেক মন্তর তন্তর আওড়িয়ে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম "দেখ পয়সাটা উড়ে যাচ্ছে"। সে খানিক হাঁ করে আকাশ পানে তাকিয়ে রইলো আমি এই ফাঁকে পয়সাটাকে পকেটের ভিতর ফেলে দিলাম।

"পয়সা গেল কোথায় ?"

আমি বললাম "উড়ে গেছে।" এহাত ওহাত দেখালাম পয়সা নেই ! সে বিস্ময়ে বলে উঠ্‌লো, "সাবাস—আচ্ছা পয়সাটাকে ফেরৎ আনো দেখি।"

কোনও মতে তার নজরকে ফাঁকি দিয়ে পকেট থেকে একটা পয়সা বার করে হাতের মুঠিতে পুরলাম। ধূলি উড়িয়ে ফুঁক মেরে হাতের মুঠি খুলতেই পয়সাটা ফিরে এলো।

সে পয়সাটাকে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললে "এ পয়সাটা সে পয়সা নয়।"

"কেন ?"

সে বল্‌লে "আমি রাজা মার্কা পয়সা দিয়েছিলাম—এটা হচ্ছে রাণী মার্কা!"

এই রে, ভরা নদী পার হয়ে শেষটায় কিনা ঘাটে এসে তরী ডুব্‌বে!

কথাটা তত বেশী খেয়াল না ক'রে বললাম, "যাত্নর কেরামতিই ত ওইখানে।"

এর পর থেকে সে আমার সঙ্গে আর একটী কথাও বল্‌লে না—চুপ করে মুখ বুজে তার মনে সে চল্‌তে লাগ্‌লো।

লুধিয়ানা (১৯১ মাইল) Clock Towerএর কাছে যখন এলাম ঢং ঢং করে তখন ৬টা বাজ্‌লো। শান্তপ্রসাদ কাপুর কথামত ত্ন'চারজন বন্ধুসহ উপস্থিত ছিল। তাদের সঙ্গে লুধিয়ানা কলেজ হোষ্টেলে গেলাম। পরীক্ষা কাছে ছিল ব'লে ছাত্ররা সব উঠে পড়ে পড়তে লেগে গেছে—বই কণ্ঠস্থ করবার জন্যে। পাঞ্জাবী ছাত্রেরা সাধারণতঃ খুব বেশী রকম পড়াশুনা করে থাকে। ক্লাশ ফাঁকি কমই দেয়, শিক্ষকের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার একেবারে তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ।

আজ সন্ধ্যের পর শান্তরাম কাপুর আর্য্য সমাজের ধর্ম্ম সভায় নিয়ে গেল। বক্তা দীর্ঘ বক্তৃতা ঝেড়ে হিন্দুধর্ম্মকে বড় দেখাবার জন্য অন্য ধর্ম্মের নিন্দা করছিলেন। তাঁর পাশে বড় একটা তৈল চিত্র ছিল—তাতে দেখান হচ্ছে, যে মুসলমানটী

তুর্কী টুপি মাথায় পরে গরুর গলা জবাই করছিলো তারই মাথায় টিকি ঝুলিয়ে শুদ্ধ করে হিন্দু করা হয়েছে, সে গরুর চরণ বন্দনা করছে। যেন হিন্দুধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য গরু-পূজা করা!

পাঞ্জাবী হিন্দুদের মধ্যে দুইটী দল। একটী সনাতন সম্প্রদায় আর একটী আর্য্যসমাজ। একের সঙ্গে অপরের আদৌ মিল নেই। আর্য্যসমাজ চায় অহিন্দুকে হিন্দু করতে, আর সনাতন সম্প্রদায় চান যা আছে তাই থাক—নাড়া চাড়ার কোনও দরকার নেই। কাজেই দু'দলের মধ্যে সদ্ভাবের যথেষ্ট অভাব।

পাঞ্জাবী হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই "পণ্ডিত আখ্যায় ভূষিত। অবশ্য তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই পাণ্ডিত্যের সাগর না হলেও যে মরুভূমি একথা স্বীকার করতেই হবে।

২-৩-২৪

জলন্ধর (২২০) এখান থেকে ২৯ মাইল দূর। সাতলেজ (শতদ্রু) নদীর কাছটীতে পথটী ভয়ানক ভাবে বেঁকে গেছে। ১৯৪ মাইলে সাতলেজ নদী পার হ'লাম—সুন্দর পোল, প্রায় আধ মাইলের উপর লম্বা। ফিলাওর (২০০) এবং ফাগওয়ারা (২১৩) দুটোই বেশ ভাল জায়গা।

জলন্ধর ছাউনিতে বেলা ৫½ টার সময় পৌছলাম, জলন্ধর সিটি এখান থেকে আরও তিন মাইল দূরে। ছাউনিতে সুবিধা

হ'লো না ব'লে সহরে গেলাম। সেখানে মৌলবী আবদুল রহমান "মেহেমান" হিসাবে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। আমি হিন্দু এ কথা তিনি জানতে পেরে মুসলমানী খানা খাইয়ে আমার জাত মারতে চাইলেন না। তাই তিনি আমার আহারের জন্য আপেল, কমলা, মনাক্কা, বাদাম এবং দুধ এনে দিলেন। খেয়ে বেশ তৃপ্তি পেলাম। দিব্যি বিছানা পেতে দিলেন, তাড়াতাড়ি করে শুলাম বটে কিন্তু ঘুম আর আসে না। যত সব লক্ষ্মীছাড়া ভাবনার দল এসে মাথার ভিতর আড্ডা পাকিয়েছিল, জানালাটা খুলে দিয়ে জলন্ধরের স্তব্ধ জনহীন অন্ধকার পথের পানে চেয়ে রইলাম।

৩-৩-২৪

জলন্ধর থেকে ২২ মাইল পথ পার হয়ে কর্পূর থানায় এলাম। এখানে দুলীচাঁদ নামে এক ভদ্রলোকের অতিথি হ'লাম। কর্পূর থানা থেকে রওনা হবার আগে রাজবাড়ী, কলেজ, হাঁসপাতাল—যা দেখবার মত দেখে নিলাম।

৪-৩-২৪

পথে একজন সঙ্গী পেলাম। সে শিখ—তার ধর্ম্মের জন্য প্রাণ কেঁদে উঠেছে। এরা ধর্ম্মের জন্য শির দিতে প্রস্তুত—তবুও "শর" দেবে না এম্নিতর জাত। সে আকালি দলভুক্ত হ'বার জন্য অমৃতসরে যাচ্ছে। ২৫০ মাইলে "নিউ ব্রিজে"

বিয়াস নদী পার হ'লাম। রাত ৭½টার সময় অমৃতসরের সীমানায় (২৭৬) পৌঁছলাম।

"ওয়াহে গুরুজি কি ফতে" (গুরুজীর জয় হোক্) বলে সে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। পরস্পর পরস্পরকে বিদায় সম্ভাষণ করলাম। সে সহরের দিকে চলে গেল। আমার সহরে যাবার কোনও দরকার ছিল না—তাই রাস্তা ধরে অগ্রসর হ'তে লাগলাম।

১১

রাত ৮টা। অমৃতসরের রেল ষ্টেশনের সামনে এসে পৌঁচেছি। আমাকে যেতে হবে, খালসা কলেজের অধ্যাপক বিজনরাজ চ্যাটার্জ্জির কাছে। খালসা কলেজ G. T. Roadএর পাশেই। একজন ভদ্রলোক বল্লেন, রাত করে খালসা কলেজের দিকে যাওয়া ঠিক নয়—সহরের অনেক বাইরে না কি প্রায় দুই মাইল দূরে। তা হ'লে ত হয় না—কোথাও থাকৃতে ত হবে। আমি জানতে চাইলাম নিকটে কোন বাঙ্গালী আছেন কি না। তিনি কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তে বল্লেন "মিউনিসিপালিটির ইঞ্জিনিয়ার রাজেন বাবুর কুঠী—এই আধ মাইল দূরে।" তাঁর বাড়ীর ধরণ ধারণ সব আমাকে বলে দিলেন। আমি রাজেন-বাবুর বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

ইঞ্জিনিয়ার বাবুর বাড়ীর কাছে আসতেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে আমার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করলে।

একটা লোক বেরিয়ে এলো। আমি তাকে ইঞ্জিনিয়ার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই বলতেই সে ভিতরে নিয়ে গেল। ইঞ্জিনিয়ারবাবুর সমীপে উপনীত হ'লাম।

"আপনি বাঙ্গালী"—আমি বাংলায় তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁর মাথায় নিখুঁতভাবে বাঁধা পাগড়ী বিরাজিত

দেখে তাঁকে বাঙ্গালী বলে ভাববার মত ভরসা পাচ্ছিলাম না। তিনি অল্প অল্প হেসে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বল্লেন "I have got a Bangali friend……" কথাগুলি এমন ভাবে বল্লেন যে তিনি নিজে বাঙ্গালী না হ'লেও তাঁর একটী বাঙ্গালী বন্ধু আছে, অতএব তাঁকে বাঙ্গালী বলে মানা উচিত। আরও বল্লেন, বাঙ্গালীরা যে ভাত খায় তাহা তিনি জানেন এবং আমি যদি কষ্ট স্বীকার করে তাঁর কাছে থাকি তবে ভাতের জন্য ভাবনা করতে হবে না।

ইনি রাজেনবাবুর বন্ধু—নাম হচ্ছে শ্রীযুত হরগোবিন্দ মাহেন্দ্র—একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার। রাজেনবাবুর কাছে আর যাবার দরকার হ'লো না।

প্রাণ খোলা কথা, অমায়িক ব্যবহার—চমৎকার ভদ্রলোক ইনি।

৫-৩-২৪

সকালবেলা খালসা কলেজে গেলাম। অধ্যাপক বিজন বাবুকে পরিচয় পত্রখানা দেখালাম। তিনি খুব যত্ন করলেন। তাঁর কি কথাতেই হাসি লেগে আছে—হাসি ছাড়া কথা নেই। সরলতা এবং প্রফুল্লতার নিবিড় মিলন তাঁর চরিত্রের উপর মনোরম ভাবে ফুটে উঠেছে।

খালসা কলেজ শিখ ছেলেদের জন্য। চারিদিক খোলা

পদব্রজে পেশোয়ার যাত্রী

বিশাল কলেজ ভবন—তার চারদিকে বাগান, মোটের উপর কলেজের 'সুরত' আছে। খালসা কলেজে তখন ভারি গণ্ডগোল চল্‌ছিল—কয়েকজন শিখ অধ্যাপক অকালি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন বলে—তাঁদের স্থানে নূতন অধ্যাপক বাহাল করা হয়েছে। ছাত্ররা তা চায় না কাজেই তারা প্রতিবাদের চিহ্ন-স্বরূপ পড়াশুনা বন্ধ রেখেছে—শুনলাম যতদিন পর্য্যন্ত না মিটমাট হয় ততদিন পর্য্যন্ত এ রকম চলবে। চেয়ার বেঞ্চি নিয়ে ত পড়ানো চলে না—কাজেই খালসা কলেজের প্রিন্সিপাল পনের দিনের জন্য কলেজ বন্ধ রেখেছেন।

বিজনবাবু অমৃতসরে কি কি দেখতে হবে বলে দিলেন। তাঁর কথামত অমৃতসর দেখতে বের হ'লাম।

স্বর্ণ-মন্দিরে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে বাইরে পা ধুয়ে নিতে হ'লো। দেখলাম অকালিরা কাল পোষাক পরে কৃপান ঝুলিয়ে মন্দিরে পাহারা দিচ্ছে। একজন অকালি প্রহরী আমাকে প্রবেশ করতে নিষেধ করলে—কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলাম "নেঙ্গা শির" অর্থাৎ খালি মাথায় প্রবেশ-অধিকার লাভ করা যেতে পারে না। মাথা খালি দেখ্‌লে এরা ভারি ঘৃণা করে। কম্বলপ্রান্ত শিরভূষণ করলাম—তার আর কোনও আপত্তি রইলো না। আমি নির্ব্বিবাদে ঢুকে পড়লাম।

অমৃতসরোবরের ঠিক মাঝখানে স্বর্ণমন্দির। গুরু রামদাস

আকবর বাদসার আমলে ১৫৭৭ সালে এই সরোবর খনন করান। আহম্মদ সা দুরানি ১৭৫২ সালে এই পবিত্র সরোবরের জল গো রক্তে রঞ্জিত করেছিল—সরোবরের পাড়ের শিখ মন্দিরগুলি ভেঙ্গে মস্‌জিদ গড়েছিল। শিখরাও প্রতিশোধ নিতে কসুর করেনি—সেই মস্‌জিদগুলি ভেঙ্গে দিয়ে তাতে শুয়োরের রক্ত—হারাম—ছড়িয়ে দিয়েছিল।

এ সব ভাঙ্গাগড়ার পর পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ নূতন করে সুন্দরভাবে এই স্বর্ণমন্দির নির্ম্মাণ করলেন। স্বর্ণমন্দির—সোনার নয়—সোনা দিয়ে রং করা তামার পাতে মোড়া। মন্দিরের অন্য নাম "গুরু দাওয়ারা" বা "দরবার সাহেব।" মন্দিরটী চার কোণা, তার চারদিকে চারটী দরজা। দরজাগুলি রূপার পাতে মোড়া। ভিতরে বাইরে চমৎকার নক্সা করা—সেগুলি শিখদের শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় দেয়। পাড় থেকে মন্দিরে যাবার জন্য শ্বেতপাথরের সেতু আছে। অমৃত সরোবরের জল সব ঋতুতেই সমান থাকে।

মন্দিরের মাঝখানে চাঁদোয়া আঁটা, তার নীচে "গ্রন্থসাহেব" —শিখদের বেদ বিরাজ করছেন। গ্রন্থসাহেবকে চামর ঢুলিয়ে বাতাস করা হচ্ছে, তার পাশে রাবেব, তানপুরা, মৃদঙ্গ বাজিয়ে ভজন গান করা হচ্ছে। গুরু নানক গান খুব ভালবাসতেন—ছবিতে প্রায়ই দেখা যায় তাঁর

সঙ্গে দু'জন শিষ্য—তার মধ্যে একজন তানপুরা বাজিয়ে গান করছেন।

গ্রন্থসাহেবের পূজা এবং আরতি হয়ে থাকে। পূজার উপকরণ কেবল মাত্র ফুল—আর কিছুই না। আরতির সময় ধূপ দীপ দেওয়া হয় ও চামর দিয়ে বাতাস করা হয়। ভক্তিভরে গ্রন্থসাহেবকে প্রণাম করলাম, কড়া (মোহন ভোগ) প্রসাদ গ্রহণ করলাম। সরোবরের জল নাকি খুব পবিত্র—পান করলে অসুখ বিসুখ সব সেরে যায়। আমার কোনও অসুখ ছিল না পরন্তু তৃষ্ণাও ছিল না কাজেই অকারণে জল নষ্ট করবার কোনও প্রয়োজন বোধ করলাম না।

সরোবরের পাড়ে অকালমুঙ্গা। প্রত্যেক দিন ভোর বেলা গ্রন্থসাহেবকে বাজনা বাজিয়ে দরবারে আনা হয়—আবার সন্ধ্যের সময় দরবার থেকে অকালমুঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হয়।

মন্দিরের এদিকে ওদিকে নানা রকম ধর্ম্মের কথা চল্‌ছে। কোথায়ও বা ধর্ম্মপুস্তক পড়া হচ্ছে এবং তার ব্যাখ্যা করে শোনান হচ্ছে।

প্রায় ধর্ম্ম আলাপই গুরুমুখি ভাষায় হয়ে থাকে। যেমন :—

"গুরু শিখমিত্ চলো গুরু বালি, মিট্টি তুন্দজাগে চালন্ হোয়া সাথ গুরু নানক প্রকট হোয়া" অর্থাৎ গুরু উপদেশ মত চলো গুরু নানক জগতে আসাতে অন্ধকার কেটে গেল।

বাবা অটল (Atal Tower) মোট আটটি তলা। নীচের তলায় দেওয়ালের গায়ে গুরু নানকের জীবনের কয়েকটি ঘটনা নিয়ে ছবি আঁকা আছে। বাবা অটল ১৩১ ফিট উঁচু।

অটল রায় ছিলেন গুরু হরগোবিন্দের ছোট ছেলে। একদিন তিনি দেখতে পেলেন একটী গরীব বিধবা ছেলে মরে যাওয়াতে ভারি কাঁদ্ছে। অটল রায়ের প্রাণ দয়ায় গলে গেল। তিনি বিধবার মরা ছেলেটীকে বাঁচিয়ে তুললেন। এ অপরাধের জন্য তাঁর পিতা তাঁকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করলেন। অটল রায় মনের দুঃখে বললেন, "একটা জীবন যখন ফিরিয়ে আনা হয়েছে—তখন অন্য একটা জীবন দিতেই হবে।" এই বলে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।

এই ঘটনা স্মরণ রাখবার জন্য শিখরা এই অটলবাবা নির্ম্মাণ করেন।

ক্লকটাওয়ারের কাছে জালিওয়ানওয়ালাবাগ। ছোট পার্ক—তার চারিদিকে ঘরবাড়ী। পার্কে দু'চারটী ফুল গাছ—সেগুলিকে যেন জোর করে জীবন্ত রাখা হয়েছে। এখানেই হাজার হাজার নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করা হয়েছিল—সে অত্যাচার-কাহিনী চিরদিন সকলের মনে গাঁথা থাক্বে। মাথা আপনা হতে নত হ'লো তাদের উদ্দেশে যারা সে অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছিলো।

রাগবাগ খুব বড় একটী বাগান। মহারাজা রণজিৎ সিংহ এখানে এসে গরমের দিনে হাওয়া খেতেন। বাগানের রাস্তাগুলি এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে বাইরে আসবার সময় একটু ঘুরপাক খেতে হয়।

অমৃতসরের নামের উৎপত্তি অমৃত সরোবর থেকে। সহর প্রাচীর দিয়ে ঘেরা—মোট তেরটী তোরণ আছে। অমৃতসর পাঞ্জাবের যে কোনও সহরের চেয়ে ধনে জনে বড়।

অমৃতসরে শাল, গালিচা, নানা রকম পশমী বস্ত্র বোনা হয়। এ কাজের জন্য বিস্তর তাঁত চলে। আজকাল গালিচা বোনার কাজ অমৃতসরে খুব জোর চল্‌ছে।

অমৃতসর এবং লাহোর শিখদের মাক্কাব (House of the Sikhs)। শিখদের সম্বন্ধে দু'চার কথা না বল্‌লে চলে না। শিখদের ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম নয়—তাদের ধর্ম্ম তাদের নিজের—গুরু নানক সে ধর্ম্মের প্রচারক। শিখ জাতি দু' শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর শিখগণ চুল কাটেন না—শিরে বেণী বাঁধেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিখরা মাথা নেড়া করে থাকেন—সাহেতারি শিখ নামে তাঁরা পরিচিত। শিখ সন্ন্যাসীরা নিরামিষ আহার করেন—গলায় মালা পরেন এবং বাবাজীর মত সঙ্গে চিমটা রাখেন।

শিখদের মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা একেবারে নিষেধ—এমন

কি তামাক পর্য্যন্ত নয়। কিন্তু আমি অনেক শিখ দেখেছি যাঁরা তামাকের নামে রেগে উঠেন—কিন্তু সরাবে গলনালি পরিষ্কার করতে কুণ্ঠিত হন না।

শিখেরা মাছ খান না—কিন্তু মাংস প্রায় সকল রকমই হজম করে থাকেন—এমন কি শূকর পর্য্যন্ত—গরুর মাংস অবশ্যই বাদ থাকে। শিখ রমণীরা অবশ্য মাংসও খান না—একেবারে নিরামিষ।

শিখেদের পাঁচটী সংস্কার আছে (১) জন্ম সংস্কার (২) লোহার বালা পরা (৩) লেখাপড়া শেখান (৪) অমৃত পান—

জলে বাতাসা গুলে গুরু গোবিন্দের নিশানের তীরে (খণ্ড) ছুঁইয়ে আনলেই খণ্ডামৃত তৈয়ার হ'লো—ছেলের একটু বুদ্ধি পাকলেই তাকে দু' এক ঢোক খণ্ডামৃত পান করান হয়। তীরে না ছুঁইয়ে সেই বাতাসা গোলা জল কৃপাণে ছোঁয়ালে কৃপাণামৃত প্রস্তুত হয়—কৃপাণামৃত পান করিতে হয় স্ত্রীলোকদের। অমৃত পানের সময় অন্ততঃ দু'চার জন শিখের উপস্থিত থাকা দরকার। (৫) বিবাহ। পুরুষদের বিবাহ করবার সময় ১৪ থেকে ৪০ বছর বয়স পর্য্যন্ত। আর মেয়েদের বিবাহের বয়স ৯ থেকে ১২। এর ব্যতিক্রম হ'লেই জরিমানা আদায় করা হয়। শিখদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে—তবে বিধবার বয়স কম করে হ'লেও ৩০ বছরের নীচে হওয়া চাই।

তাঁদের মধ্যে সুখে দুঃখে পূজায় পার্ব্বণে সব সময়ই বাজনা বাজাবার রীতি আছে। আমোদ প্রমোদের সময় পরমাত্মার গানই গাওয়া হয়।

শিখরা ঈশ্বরকে অপার, অগম্য, নিরাকার বলে মনে করেন। মূর্ত্তি পূজার তাঁরা বিরোধী। কিন্তু গ্রন্থসাহেবকে এমন ভাবে পূজা করেন যে তা মূর্ত্তি পূজার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। পাঁচবার তাঁদের উপাসনার সময়—খুব ভোরে, সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে।

কার্ত্তিক পূর্ণিমায় গুরু নানকের এবং পৌষ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্মোৎসব হয়। এই দুটী দিন তাদের কাছে ভারি আমোদের।

শিখ মেয়েরা পা-জামা আর কামিজ পরে—ঘোমটার মত করে ওড়না গায়ে দেয়—পায়ে চটি জুতাও পরে। শিখ পুরুষদের হাতে কড়া, শিরে কেশ, বেণীতে কঙ্গা (চিরুণী) কোমরে কৃপাণ এবং পরণে কাগর (under wear) থাকাই চাই—

৬-৩-২৪

"রাজকোট হিন্দু হোষ্টেলে" খালসা কলেজের ছাত্রগণ নিমন্ত্রণ করলেন তাদের ওখানে খাবার জন্য। নিমন্ত্রণ গ্রহণে আমার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। আহারাদির পর হোষ্টেলের 'বুলবুল' তার শানিত গলা নিয়ে বাছাই বাছাই

গান গাইতে লাগলো। গান তো মোটেই নয়—উপরন্তু উৎপাত বিশেষ। তার গান গাইবার শক্তিকে প্রশংসা না করলেও তার গান গাইবার সাহস এবং সখকে প্রশংসা না করে থাকতে পারা যায় না। ভাগ্যি ভাল সে সময় হোষ্টেলের সুপারিনটেনডেণ্ট এসে পড়লেন। বুলবুলের আবেগ আচমকা থেমে গেল—তার কবল থেকে এত শীঘ্র উদ্ধার পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলাম।

৭-৩-২৪

বিজনবাবু তিব্বত গিয়েছিলেন। রাত্রে বসে বসে তাঁর তিব্বতের গল্প শুন্‌লাম—রাত ১২টার সময় শুতে গেলাম।

এলার্ম ঘড়িটা কেমন বিশ্রীভাবে কানের গোড়ায় বেজে উঠ্‌লো। সামান্য একটা ঘড়ি সেটাও তাড়া দেয় তাড়াতাড়ি বিদায় হবার জন্য।

কিড়িং কিড়িং কিড়িং, আবার কাণের কাছে বেজে উঠ্‌লো। ভোরের বেলা এত জালাতন সইবার মত ধৈর্য্য আর খুঁজে পেলাম না। এলার্ম কণ্ঠে ফাঁসি লটকালাম, ঘণ্টা বাজান বন্ধ করবার জন্য চাবিটা টেনে দিলাম। ঘড়িটা নির্জ্জীবের মত শব্দ করতে লাগলো—টিক্‌-টিক্‌-টিক্‌-টিক্‌। আমি মনে মনে বললাম তোমার এই ঠিক্—একটু আগেই না বড় কাণ ঝালাপালা করে লাফাচ্ছিলে এখন কেমন শুধু বুক ধুক্‌ধুক্‌।

লেপখানা ভাল করে জড়িয়ে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে একটু ঘুমাবার উপক্রম করছি এমন সময় বিজনবাবু ডাকছেন "পরাগ-পরাগ"— নিতান্তই আর নিস্তার পাওয়া গেল না—বিছানা ছেড়ে কোনও রকমে উঠ্‌লাম।

৮-৩-২৪

বিজনবাবু গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পর্য্যন্ত পৌছে দিলেন। তাঁকে বিদায় নমস্কার জানিয়ে লাহোর যাত্রা করলাম। রাস্তার দু'ধার দিয়ে খালের জল বয়ে যাচ্ছে, এ পথটী বেশ ছায়ায় ঢাকা।

রাস্তায় দেখতে পেলাম তিনটী মানুষ বোঝাই উট সারি বেঁধে চলেছে। মাঝের উটের পিঠের বোঝা খুব হাল্কা— একটা শিখ যুবক ও একটী বালিকা মাত্র। যুবক নিজেই উটের চালক—তাদের দু'জনের পরণে রঙ্গীন কাপড়চোপড়, শুনলাম তাদের নূতন বিয়ে হ'য়েছে। যুবকের মন আনন্দে ভরপুর ছিল—তা তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়। বালিকার মুখখানি আস্‌মানি ওড়নায় আবরিত ছিল—দেখ্‌তে ভারী ইচ্ছে করছিলো তার মুখখানি কেমন, আমাদের দেশের ক'নে বৌদের মত তার মুখচন্দ্র কান্নার বন্যায় প্লাবিত কি না। কিন্তু ওড়না তার শিথিল হয়ে পড়লো না—অদৃষ্টেও দর্শন ঘটলো না।

সেলিমার বাগ বাঁয়ে পড়লো। লাহোর (৩১৩) এখান থেকে তিন মাইল দূর। সহরের কাছে রাস্তাটী আশ্চর্য্যভাবে

চেহারা বদল করেছে! খালি ধুলোয়-ধুলোয় ধুল পরিমাণ! সহরের ভিতর গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের নাম মল রোড (ঠাণ্ডি সড়ক), সুন্দর রাস্তা সন্দেহ নেই।

সনাতন ধরম কলেজের দু'তিনজন ছাত্র তাদের হোষ্টেলে থাকবার জন্য ধরে নিয়ে গেল। কোনও বিষয়ে অসুবিধা নেই—তবে তাদের প্রশ্নের প্রবাহ এত দুরন্ত যে শেষটায় বিরক্ত ধরে যায়।

পাঞ্জাবী ছাত্রদের মধ্যে বার আনা ছেলেই বাবুয়ানিতে মাষ্টার। ঢিলে ঢোলা পা-জামা পাঞ্জাবী ছেড়ে দিয়ে সাহেবী পোষাক অঙ্গে চড়িয়েছেন চটপটে হবার জন্য। বাঙ্গালায় এখন বাবুয়ানি দিনের দিন কমে আসছে বলে মনে হয়, পাঞ্জাবে শিক্ষার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাবুয়ানির মাত্রাও বাড়ছে।

সনাতন ধরম কলেজ ডোনাল্ড টাউনে। ডোনাল্ড টাউন পার্কে ভরা—রাস্তার এধারে ওধারে ছোট বড় পার্ক—সিজিন ফুলের হাসিতে আলো করে রেখেছে। ছাত্ররা সব পার্কে বসে বই পড়ছে। বিশেষ করে পরীক্ষার সময় পার্কে বসে পড়ার ধুম লেগে যায়।

৯-৩-২৪

লাহোর সিটিতে গিয়েছিলাম। ভারী অপরিষ্কার অলি গলি পথ, ঘিঁজি ঘিঁজি বাড়ী ঘর, আলো কিম্বা বাতাসের

একটুকুও অবকাশ নেই—পাছে ঐ পর্দ্দানসীনার সৌন্দর্য্য বাইরে উছলে পড়ে।

ধরণ ধারণ, চালচলন ঠিক সেই হারুণ-উল-রসিদের সময়কার মত।

অল্প পরিসর রাস্তা—তার উপর বিচিত্র টঙ্গাযানের রকমারি আনাগোনা—ঠিকরে গিয়ে পড়তে হয় রাস্তার পাশে। সিটিতে তখন প্লেগ দেখা দিয়েছে, রোজই দশ বার জন করে পটল তুল্‌ছে! এমনতর জায়গায় যদি এহেন রোগের আড়ত সৃষ্টি না হয় তবেই আশ্চর্য্যের বিষয়!

সন্ধ্যের পর আনারকলি বাজারে এলাম। বড় বড় কারবার, দোকানপাট, সাহেবদের বাংলো ইত্যাদি আনারকলিতে।

আনারকলি (দালিম ফুল) ইরাণী তরুণী আকবরের খাসমহলের বাঁদী। তার রূপ-মদিরার নেশাদার ছিলেন সেলিম। একদিন আনারকলি অলস প্রেমিকের মন দোলান ছন্দে নাচ্‌ছিলো। তার চটুল চোখের চমক চাহনি গিয়ে পড়্‌লো সেলিমের উপর, যে তার দরদ্‌ বুঝতো। সঙ্গে সঙ্গে তার পাপড়ী-পারা পাতলা ঠোঁটের কোলে একটু মধুর হাসি জেগে উঠ্‌লো। এটা কিন্তু আকবরের চোখ এড়ালো না। তিনি বাঁদীর বেয়াদবি সইতে পারলেন না—আনারকলিকে (তখনও কলি ছিল) জীবন্ত কবর দিলেন, লাহোর সহরের

প্রান্তে। সেলিমের পিপাসা-আকুল প্রাণপ্রিয়ার জন্য কেঁদে উঠ্‌লো। তারপর সেলিম যখন দিল্লীর মসনদ পেলেন তখন আনারকলির কবরের উপর সমাধি ভবন তুললেন। এ সমাধি ভবনে অনেকদিন পর্য্যন্ত চার্চ্চের কাজ চলেছিলো এখন Secretariateএর Record Roomএ পরিণত করা হয়েছে। আনারকলির কবরটা খুঁড়ে পাশে রাখা হয়েছে। কবরের গায়ে পরিষ্কার অক্ষরে খোদিত আছে ঃ—

'আগার মনবাজ বিনাম রুয়ে ইয়ারী-ই-খায়েসরা
তা কিয়ামত্ সুকর গুয়াম কদর গার-ই-খায়েসরা'

মজনুন্ সেলিম-ই-আকবর

সেই মুখখানি যদি আর একেবারের জন্যও দেখতে পেতাম তবে পৃথিবীর শেষ দিন পর্য্যন্ত ভগবানকে ধন্যবাদ দিতাম।

আকবরের প্রেমাতুরা পুত্র সেলিম।

আনারকলিতে খুব খানিকক্ষণ বেড়িয়ে নিলাম। সন্ধ্যের পর ল' কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ কে, সি, চ্যাটার্জ্জি সাদর অনুরোধ করলেন তাঁর বাড়ীতে থাকবার জন্য। সনাতন ধরম কলেজ থেকে কম্বল আর বাণ্ডিলটা নিয়ে প্রিন্সিপাল মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হ'লাম। তাঁর অনুরোধ কাঁটায় কাঁটায় পালন করলাম।

১০-৩-২৪

সকাল বেলা ছুঁচ সূতো নিয়ে গেলাম জীর্ণ কম্বলখানার চিকিৎসা করতে। তালি মারতে মারতে বেচারার স্বরত বদ্‌লে গেল। ভ্রমণ করা ফকির এবং আমীরের পক্ষেই সম্ভব। আমার কম্বলখানির দশা ফকিরের কম্বলের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে সেলিমার বাগ (আনন্দ কানন) দেখতে গেলাম। এত সুন্দর বাগান আর কোনও দিন দেখিনি। কথিত আছে সাজাহান স্বপ্নে স্বর্গ দেখেন—মুসলমানদের স্বর্গ সপ্তস্তর বিশিষ্ট। তার নকল করে এই বাগান রচনা করা হয়। আগে সাতটী ধাপে বাগানটী সাজান ছিল, এখন তিন ধাপ বর্ত্তমান আছে—সব সমেত লম্বায় আধ মাইল। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপরই বাগানের ফটক—চারিধারে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা; প্রত্যেক কোণায় এক একটা করে ছোট মিনার। প্রথম ধাপে বড় বড় ফলের গাছ ও জল সরবরাহ করবার জন্য খুব বড় চৌবাচ্চা আছে। দ্বিতীয় ধাপে বেগমদের স্নান করবার জন্য ঘরের মত করা—ঢালু, খাঁজ কাটা শ্বেত পাথরের উপর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে—খাঁজে খাঁজে বাধা পেয়ে জলের ধারা ছিতরে পড়ে রূপোর টুকরোর মত চিক্ চিক্ ক'রে উঠছে। পাথরের সরসী তার উপর সেতু নির্ম্মিত। জলের উপর

পদ্মপাতা সবুজ আঁচল বিছিয়ে রেখেছে। মাঝখানে ফোয়ারার সারি—এত ফোয়ারা মোগলদের কোনও বাগানেই নেই—তার দু'পাশ দিয়ে বাঁধান পথ। গোলাপ বাগিচা, সিজিন ফুলের বিছানা, নানা রকম ফুলগাছের কুঞ্জ উপবন, আগন্তুকের মন ভুলিয়ে নিয়ে যায়।

শেষ ধাপে ঘাসে ঢাকা মাঠ—কে যেন সবুজ গালিচা বিছিয়ে রেখেছে। এখানেও ফুলের ছড়াছড়ি—ভারি সুন্দর!

সহরে ফিরবার সময় দেখলাম ভিক্ষারঝুলি কাঁধে করে কয়েকজন মুসলমান "লায় লাহে ইল্লিল লা" বলতে বল্‌তে ভিক্ষা প্রার্থনা করছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, তারা লাহোরে প্লেগ রোগ কমাবার জন্যে কোন পীরের দরগায় সিন্নি চড়াবে—তার জন্য ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছে।

নীলা গম্বজ, মেডিকেল কলেজ, লরেন্স গার্ডেন, মিউজিয়াম ইত্যাদি না দেখে থাকৃতে পারলাম না।

১১-৩-২৪

আজকে খোলসটা বদলে ফেললাম। প্রিন্সিপাল মহাশয়ের দেওয়া একটী কাপড় ও একটী সার্ট পরে বাঙ্গালী হ'লাম। পুরাণো সার্ট আর প্যাণ্টটীকে নিষ্ঠুরের মত বিদায় করে দিলাম। ঢাকা থেকে লাহোর পর্য্যন্ত সখ্যতা করে তাদের ছাড়তে ভারি কষ্ট হতে লাগলো। বোঝা বইতে মন চায়

না—তা না হ'লে ওগুলিকে সঙ্গে নিতে কোনও আপত্তি ছিল না।

লাহোর থেকে ৩ মাইল পরে রাবী নদী পার হ'লাম। নদীর অপর পারে নূরজাহানের দিলখুস বাগানে জাহাঙ্গীরের সমাধি-মন্দির—গঠন প্রণালী ইতমাত্ উদ্দোলার অনুরূপ। কত চাঁদিনী রজনী বিরহে কেটে গেছে এই বাগে। জ্যোছনা রাতে চাঁদের আলোয় কুঞ্জে বসে নূরজাহান আকুল নয়নে চেয়ে থাকতেন—কখন সেলিম (জাহাঙ্গীর) আসবে।

"But see ! the rising moon of heaven again Looks for us Sweet heart through the quiever-ing plain. How of here after rising shall she look. Among those leaves for one of us in vain."

সেলিমের আগমন হ'লো না। গোলাপের মিষ্টি গন্ধে তিনি আবেশ হয়ে পড়লেন, মৃদুল পবন তার চিকুর পাশে স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে পালিয়ে গেল। সামনে শফিয়া পাত্রটী মদিরায় পরিপূর্ণ করে দিল—নূরজাহান চোখ মেলে চাইলেন—কই সেলিম তো তখনও আসেন নি।

মোগল সমাধি-মন্দিরে যেমন বাগান থাকে এখানেও সে রকম বাগান আছে। সমাধি-ভবনের মিনারের উপর থেকে লাহোর নগরের দৃশ্য খুব মনোরম। সামনে রাবী নদী

এক ছড়া রূপোর হারের মত লাহোর সহরের কাছ দিয়ে বয়ে গেছে।

এর কাছেই নূরজাহানের—ছনিয়ার সেরা রূপসীর কবর। মনে করেছিলাম কত না সুন্দর হবে। কিন্তু গিয়ে সে ভুল ভেঙ্গে গেল—সামান্য একতালা একখানা ভাঙ্গা বাড়ী তাঁর কবর! নূরজাহান নাকি বলেছিলেন—আমার কবরের উপর ফুলের উপহার যেন না দেওয়া হয়—বাসি স্মৃতি জাগিয়ে তুলবার কোনও দরকার নেই, বাতি দানও কেউ করো না—তাতে এ হীনার জন্য কতকগুলি পতঙ্গ পুড়ে মরবে বইতো নয়।

এ সব দেখে নিয়ে ১½ পথ চলে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে ফিরিলাম—বেলা ১১½ বাজে গুজরানওয়ালার দিকে রওনা হ'লাম।

১২

১১, ৩, ২৪

লাহোর থেকে ১৬ মাইল চলে মুরিদকিতে এলাম। গ্রামে গিয়েছিলাম আস্তানা খুঁজবার জন্যে, কিন্তু গ্রামের সবাই খোপিয়া-পুলিশ (পুলিশের চর) ভেবে তাড়িয়ে দিলে। মুরিদকি রেলওয়ে ষ্টেশনে গেলাম। ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয় বালি-কাগজের খাতাখানির ওপর কালি খরচায় ও কলমের খোঁচায় প্রিয়তম ট্রেনের আগমন নিগমন বার্ত্তা অনিচ্ছা সত্ত্বেও লিখ্‌ছিলেন। ভিতরে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়ালাম। তিনি প্রেম-লিপি লেখা বন্ধ করলেন, পাগড়ী খুলে একপাশে রাখলেন—সূক্ষ্ম টিকিটা নেড়ে দেখ্‌লেন ঠিক আছে কি না—আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "কি চাও?" একধার থেকে মদীয় উপাখ্যান সরল ভাষায় বর্ণনা কর্‌লাম।

তিনি পাগড়ীটা তুলে মাথায় চাপিয়ে কলমটা কাণে গুঁজে স্থির হয়ে বসে বল্‌লেন "সব ঠিক করে দেব'খন—এখন এস গল্প করা যাক্।" কিন্তু গল্প ভালো জম্‌লো না, টেলিফোনের ঝুন ঝুন, টেলিগ্রাফের টরে টক্কা টক্ টক্, এঞ্জিনের হাঁচি কাসি কোঁস ফাঁস বড়ই জ্বালাতন কর্‌ছিল। চুপ করে ভাবছিলাম,

কতক্ষণে ষ্টেশন মাষ্টারের ডিউটী ফুরাবে আর এ বিপদ থেকে রক্ষে পাবো।

১২, ৩, ২৪

সাডোকি ও খিলানওয়ালী দুটী বড় গ্রাম অতিক্রম করে ২৫ মাইল পরে গুজরানওয়ালাতে (৪২) এলাম। থানাটী G. T. Roadএর পাশেই। রাস্তার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম —থানার ছোট দারোগা ডাক্ দিলেন। গেলাম তাঁর কাছে। আমার যা বলবার ছিল তা বল্‌লাম। তিনি অনেকক্ষণ মস্তিষ্ক চালনা করেও নির্দ্ধারণ করতে পারলেন না,—হেঁটে পেশোয়ার যাবার উদ্দেশ্য কি? কাজেই তিনি আমাকে বড় দারোগার বিবেচনার জন্য অপেক্ষা করতে বল্‌লেন। বড় দারোগা এলেন। তিনি পেশোয়ার পর্য্যটন নামে যে ভীষণ রহস্য আছে তা ভেদ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। আমি একটী কথারও উত্তর না দিয়ে আমার চিঠির তাড়াটী তাঁর কাছে ফেলে দিলাম। তিনি চট্‌পট খুলে সব পড়তে আরম্ভ করলেন।

পথে অনেক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম-আর তাঁদের কাছ থেকে কিছু কিছু লিখিয়ে আনতাম। পরিচয় পত্র যে সব পেতাম তা কাজ শেষ হ'য়ে গেলেই গুছিয়ে নিজের কাছে রেখে দিতাম। পকেটে অনেক চিঠি জমেছিল—সে সব চিঠিগুলি তাঁকে দেখ্‌তে দিলাম।

তিনি চিঠি পড়তে পড়তে বললেন—"ভট্টাচার্য্যি আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছেন দেখ্‌ছি—অম্বালা কলেজে তিনি আমাকে পড়িয়েছেন—বাঃ বেশ।"

তখন তিনি তাঁর ব্যবহারের জন্যে খুব দুঃখ করতে লাগ্‌লেন।

তিনি আমাকে খুব করে খাইয়ে আমার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলেন। সে রাত্রে থিয়েটার হচ্ছিলো—তিনি দেখাতে নিয়ে গেলেন। থিয়েটার এমন ভালো লেগেছিলো যে, প্রথম ২।৩ সিন হবার পরই উঠে আস্‌তে হ'লো। ১১½ টার সময় থানাতে ফিরলাম। থানাদার সাহেব আমার জন্যে পরিপাটি বিছানা করে দিলেন। তাঁকে নমস্কার জানিয়ে শুতে গেলাম।

১৩, ৩, ২৪

থানায় থাকা মানায় না। অখণ্ডানন্দ সমাধের কর্ত্তৃপক্ষের ওপর একখানা চিঠি ছিল—সেখানে উপস্থিত হ'লাম। এখানে দু'চার জন বড় বড় সাধু থাকেন। তাঁদের কাছে ধর্ম্মের ব্যাখান শুন্‌লাম—মন আনন্দে ভরে গেল।

গুজরানওয়ালা মহারাজ রণজিৎ সিংহের জন্মভূমি। রেলষ্টেশন থেকে আধ মাইল দূরে রণজিৎ সিংহের সমাধি। গুজরানওয়ালা জিলায় কমলা লেবুর অনেক বাগান আছে। এ অঞ্চলে গুজরানওয়ালার কমলার বেশ নাম। সহরের মিস্ত্রীর

লোহার সিন্দুক ও আলমারী বানাতে খুব ওস্তাদ, আর এ সব বিক্রীও হয় যথেষ্ট।

আজ সন্ধ্যের পর কারতার সিং নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, বাঙ্গালীরা মাথায় টুপি এবং তাদের মধ্যে অনেকে পায়ে জুতো পরেন না কেন?"

পাঞ্জাবে শীত এবং গরম দুটোরই প্রকোপ বেশী বলে পাঞ্জাবীরা সবাই জুতো পরে, এমন কি মুচি মেথর পর্য্যন্ত বাদ যায় না। আর পাগড়ী না হয় টুপি মাথায় থাকবেই।

আমার মাথা এবং পা খালি দেখেই বোধ হয় তিনি আমাকে এ রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। আমি সোজা কথায় উত্তর দিলাম "দরকার হয় না বলে পরে না।"

তিনি কিন্তু বল্‌লেন "না—ঠিক তা নয়, তোমরা (বাঙ্গালীরা) প্রতিজ্ঞা করেছ যে, যতদিন পর্য্যন্ত না ইংরেজদের তাড়াতে পারবে ততদিন পর্য্যন্ত তোমরা মাথায় টুপি এবং পায়ে জুতো পরবে না।"

তাঁর এই অভিনব মন্তব্যে আমি খুবই গৌরব অনুভব করেছিলাম।

পাঞ্জাবীরা বাঙ্গালীদের খুব সম্মানের চোখে দেখে।

বাঙ্গালীদের ইলম (বিদ্যা) এবং দেমাক্ এর (সাহস) প্রশংসা তাদের মুখে আর ধরে না।

১৪, ৩, ২৪

গুজরানওয়ালা থেকে উজিরাবাদের দিকে চল্‌লাম। ঘাক্করে (৫৩) কিছু খেয়ে নিলাম। উজিরাবাদ লাহোর থেকে ৬২ মাইল এবং গুজরানওয়ালা থেকে ২১ মাইল দূর। ডাঃ অমরনাথ বাজাজ এম-বি, বি, এস-সি সমাদরে তাঁর গৃহে আশ্রয় দিলেন।

উজিরাবাদ একটী বড় বাজার। সহরের ভিতর দিয়ে একটী বড় রাস্তা এ মাথা থেকে সে মাথা পর্য্যন্ত বিস্তৃত—তার দু'ধারে দোকানের সারি। ছুরি, কাঁচি, পিতলের কাজ করা হুকোর ডাবা, নানা রকম বাসন ইত্যাদি উজিরাবাদের কারিগরদের বাহাদুরীর পরিচয় প্রদান করে। সহরে পানীয় জলের জন্য নলকূপ (Tube well) ব্যবহার করা হয়—সব সময়েই পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল পাওয়া যায়।

সিয়ালকোট এখান থেকে ২৭ মাইল দূর। সিয়ালকোট থেকে জম্মু—যেখানে কাশ্মীরের মহারাজা শীত কাটান—হয়ে শ্রীনগর যাওয়া যায়। শ্রীনগর যাবার জন্যে যদিও খুব বাসনা ছিল তবু আগে পেশোয়ার যাওযাই উচিত বিবেচনা করলাম।

১৫, ৩, ২৪

সহরের সীমানায় চেনাব নদী। আলেকজেন্দ্রিয়া ব্রিজের ওপর দিয়ে পার হ'লাম। ১৮৭৬ সালের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ (সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড) এই সেতুর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

খানিকটা পথ চলতেই একজন সঙ্গী পেলাম। একটা খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে, এক হাতে লাগাম আর এক হাতে হুকো ধরে খুট খুট করে চল্‌ছিল। মাঝে মাঝে হুকো টানছে, ধোঁয়া কিন্তু একটুও বেরুচ্ছিলো না তবুও সে টেনেই চল্‌ছে। সঙ্গী মশায়ের চাল নবাবজাদার মত। খচ্চর পিঠে সওয়ার, হাতে হুকো—মেজাজটা তার অন্য রকম ছিল। কথাবার্ত্তা তেমন কিছু হোল না।

দুপুর বেলা গুজরাটে (৭১) এলাম। ভকিল সোটি চরণ দাস মহাশয়ের বাড়ীতে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সেরে নিলাম। গুজরাটে তখন Horse show হচ্ছিলো—Horse showতে টাট্টু ঘোড়া ও খচ্চরের সংখ্যাই অধিক ছিল—এগুলি দেখ্‌তে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও কাজে খুব মজবুত।

কারলা গ্রাম—যেখানে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ (২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৪৯) হয়েছিল—সহর থেকে আড়াই মাইল দূরে। এই শিখ-যুদ্ধের পরই সদাশয় ইংরাজ বাহাদুর পাঞ্জাব দখল করে বস্‌লেন।

বৈকাল বেলা লালামুসাতে এলাম—গুজরাট থেকে দূরত্ব মোটে ১১ মাইল। লালামুসা N. W. Rএর একটা বড় ষ্টেশন। G. T. Roadএর ওপর লালামুসা বাজারে সবই পাওয়া যায়, শুধু পাওয়া গেল না আশ্রয়। বার বার সাতবার লোকের কাছে বিমুখ হয়ে আশ্রয়ের জন্যে অষ্টম অভিযান করতে আর উৎসাহ পেলাম না। গাছের শুক্‌নো ডালগুলি ভেঙ্গে কাঠ জড় করলাম—কাশ্মীর পাহাড় এখান থেকে খুব কাছে কি না তাই খুব শীত। পথের ধারে আগুন জ্বেলে থাক্‌বো মনে করছি এমন সময় ধড়া চূড়া সজ্জিত থানাদার সাহেব এই পথ দিয়ে আগমন করছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি ঠিক ঠিক সব বলে গেলাম।

তিনি তাঁর অতিথি হবার জন্যে অনুরোধ করলেন। যাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করি ভাগ্যদোষে তারই কবলে আট্‌কা পড়ে যাই—জ্বালাতন আর কি! পুলিশের অতিথি মানে খুব সোজা, মোটেই মাথা ঘামাতে হয় না। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তো গেলাম। থানার Dairy Bookএ তে আমার সম্বন্ধে খানিকটা লিখে নিলেন—কিন্তু যা মনে করেছিলাম তা কিছুই হলো না। এক টুকরী আপেল জানি না কোত্থেকে এনে তিনি জুটিয়েছিলেন। অভ্যর্থনার পালা আপেলের ওপর দিয়ে বৌনি করা হ'লো—তারপর একটু রাত হলে লুচি মাংস হাজির করলেন—

ক্ষিদের কোনও অভাব ছিল না। খেতে খেতে মনে হ'লো—আ! মঙ্গলসেনের (দারোগা সাহেবের নাম) কি বুদ্ধি—তা না হ'লে আজ গাছতলায় পড়ে থাকৃতে হ'তো। মঙ্গলসেন এ ছাড়া ঝেলামের জন্যে পরিচয় পত্র লিখে দিলেন।

লালা আর মুসা দু'জনে পাশাশাশি বাড়ীতে থাকৃতো। ছোট বেলা থেকেই দু'জনার খুব ভাব। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লালা যুবকে পরিণত হ'লো আর মুসা তখন কিশোরী তার চারু অঙ্গে লাবণ্য আর ধরে না। লালা ছিল হিন্দু আর মুসা ছিল মুসলমান। তারা ভাল ক'রে জানৃতো যে তাদের বিয়ে হতে পারে না—তবুও তাদের ভালবাসায় ভাটা পড়লো না। একদিন এক অচেনা মুসলমান যুবকের সঙ্গে মুসার বিয়ে হয়ে গেল, মুসার চোখে দরিয়া বইল। লালার সোনার স্বপন টুটে গেল সে সইতে না পেরে প্রাণত্যাগ করলে। মুসাও তার অনুসরণ করলে সেই অমরলোকে, যেখানে জাতি বিভিন্নতার অন্তরায় নেই—সেখানে তাদের মিলন নিশ্চয় হবে।

এই প্রেমিক যুবকের নাম থেকে এই জায়গার নাম লালামুসা হয়েছে।

১৬, ৩, ২৪

ভোরের বেলা কাশ্মীর পাহাড়ের অনুপম শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে চল্‌তে লাগলাম। তরুণ অরুণের হিরণ কিরণ তার

তুষার ভূষণের ওপর চমৎকার রংয়ের বাহার লাগিয়ে দিয়েছিলো।

এ সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার বেশী সময় পেলাম না। তিন চার মাইল চলবার পর রাস্তাটা বেজায় বেঁকে গেল। ক্রমে ক্রমে অল্প স্বল্প চড়াই উৎরাই সুরু হ'লো। ছোট খাট ঝোপ জঙ্গল, মাঝে মাঝে কুলি মজুর যারা রাস্তায় কাজ করছিলো, তাদের ছাড়া বড় একটা কাউকে দেখা যায় না। এম্নিভাবে মাইল ৩০ পাব্বী পাহাড়ের উপর দিয়ে চল্‌লাম। ঝেলাম নদী দূর থেকে একটী রূপোর রেখার মত দেখাচ্ছিলো। ১০১ মাইলে ঝেলাম নদীর পুলের কাছে এসে পড়লাম। পুলের দু'মাথায় দু' ফটক, তাতে চার চার জন করে রাইফেল কাঁধে মিলিটারি পাহারা। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত গেট খোলা থাকে, তাপর বন্ধ হয়ে যায়। মিলিটারি পুলিশ সিভিল পুলিশের চেয়ে অনেক ভালো, পথিককে জ্বালাতন করে না। পীরপাঞ্জাল পাহাড়ের শোভা ঝেলাম নদীর পুলের ওপর থেকে ভারি চমৎকার দেখা যাচ্ছিল। ঝেলাম নদীর স্রোত খুব ধারালো। কাশ্মীর পাহাড় থেকে কাঠ কেটে এই নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, আর ঝেলাম সহরে সেই কাঠগুলি উঠান হয়। ঝেলাম সহর বড় রকমের একটী কাঠের ডিপো। সহরে যাঁর অতিথি হলাম তাঁর নাম সোধি মঙ্গল দাস এল-এল, বি, তাঁর যত্নে পথের কষ্ট ভুলে গেলাম।

বর্ত্তমান ঝেলাম সহর নিতান্ত আধুনিক। পুরাতন সহর (Bucephala of Alexander) ঝেলাম নদীর অপরপারে অবস্থিত ছিল। ষ্টেশনের কাছে খনন কালে অনেকগুলি পুরাণো স্তম্ভ এবং মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছিলো, সেগুলি লাহোর মিউজিয়মে যত্নের সহিত রাখা হয়েছে।

১৭.৩.২৪

সকালে ঝেলাম নদীতে স্নান করে নিলাম। জল খুব ঠাণ্ডা —যেন সদ্য বরফ গলা। স্নান করবার পরই সর্দ্দি ধরে গেল। বেলা ৯টার সময় ঝেলাম থেকে রওনা দিলাম। ঝেলাম থেকে মাইল দু'তিন আন্দাজ বেশ ভালোয় ভালোয় যাওয়া গেল। তারপর আবার পাহাড়, রাস্তাটীও ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি ধারণ করলে, নীচু। দু'পুর বেলা দীনা ষ্টেশনে খাওয়া দাওয়া করলাম। বেলা উঁচু আর ২টার সময় দীনা থেকে রওনা হয়ে বেলা ৫½ টার সময় জেমেলিতে পৌঁছলাম। অগতির গতি জেমেলি রেলষ্টেশনের প্লাটফরমে কোনও গতিকে রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

১৮.৩.২৪

সকালবেলা জেমেলি থেকে রওনা হ'লাম। সোহাওয়ার কাছাকাছি পথটী জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে গেছে, তার ওপর আবার পাহাড়ে রাস্তা—সোণায় সোহাগা। কাঁকর কণায় পাথর কুচিতে পায়ের তলায় যেন হুল ফুটছিলো। কিন্তু পথ

চলে চরণ যুগলের তলদেশের চামড়া এত পুরু ও শক্ত হয়েছিলো যে এসব সামান্য ব্যাপার গ্রাহ্য করবার মত সময় ছিল না। রাস্তাটী Salt Rangeএর উপর দিয়ে চলে গেছে—এসব জায়গা এমন নির্জ্জন ও এমন ভীষণ যে তা আর বলবার নয়! মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়ে নদী রাস্তা থেকে অনেক নীচে পুলের তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

আজ বিকাল বেলায় একটা গান শুন্‌লাম—গানটী খুব মিষ্টি আর ভাবও চমৎকার। জীবনে কোনদিন বোধ হয় ভুলবো না। সে পাহাড়ে পথের ওপর গেয়ে গেয়ে চলে যাচ্ছিলো—সঙ্গে তার কেউ ছিল না।

"আঁশুও থাম যাও মেহফল্ মে খোদাকে বাস্তে।
ভরনা হ'য়ে রাজেনেহা সবপর আঁইয়া হো যায়ে গা॥"

হতাশ প্রেমিক তার চোখের জলকে সম্বোধন করে বল্‌ছে—ওগো অশ্রু এখন থেমে যাও, দেখছ না এখানে কত লোক; অন্ততঃ খোদার নামেও একবারটী থেমে যাও, তা না হ'লে আমার অন্তর-ব্যথা যে লোকের কাছে ধরা পড়ে যাবে।

সে চায় তার অন্তর বেদনা গোপন রাখতে—আর নীরবে অশ্রুমোচন করতে।

পথটা একটু বেঁকে গেল—সে পাহাড়ের ওধারে কোথায় মিলিয়ে গেল কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তার গান শোনা যাচ্ছিলো।

১৪৫ মাইলে গুজরখান। গুজরখানে এক শিখ দোকানদারের দোকান ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করলাম।

১৯.৩.২৪

গুজিরখান থেকে বেরিয়ে রেওয়াই (১৭০) চাকলালা (১৭৪) হয়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে (১৭৯) এলাম। রাওয়ালপিণ্ডির জন্যে অনেকগুলি পরিচয় পত্র পাওয়া গিয়েছিলো, তার মধ্যে কোনটা এখন ব্যবহার করবো তাই নিয়ে গণ্ডগোলে পড়ে গেলাম। ভেবে চিন্তে প্রমথবাবুর কাছে যাওয়াই ঠিক করলাম। প্রমথবাবু খুব আদর যত্ন করলেন। রাওয়ালপিণ্ডিতে অনেক বাঙ্গালীর সঙ্গে পরিচয় হ'লো। রাওয়ালপিণ্ডিতে লাহোরের মত বাঙ্গালী নেই—৫০।৬০ জন আন্দাজ হবে। এখানকার বাঙ্গালীদের মধ্যে দুটী দল—একটী হচ্ছে চাক্‌লালা শ্রেণীর আর একটী রাওয়ালপিণ্ডি শ্রেণীর। রাওয়ালপিণ্ডির বাঙ্গালীদের কালী-বাড়ী খুব বড়, সেখানে বাঁধান ষ্টেজ, লাইব্রেরী ইত্যাদি আছে।

রাওয়ালপিণ্ডি ছাউনির ভিতর চার মাইলের জন্যে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের নাম হ'য়েছে মল রোড। মল রোডের দু'পাশে ছোটখাট বাগান—এ পথে চলতেও ভারি আনন্দ হয়।

২১.৩.২৪

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে মাররী হয়ে টোঙ্গায় কিম্বা মোটরে কাশ্মীর যাওয়া যায়।

পদব্রজে পেশোয়ার যাত্রী

ভোরবেলায় রাওয়ালপিণ্ডি থেকে রওনা হ'লাম। প্রমথবাবু অনেকগুলি বাদাম সঙ্গে দিয়ে দিলেন। পথে চলতে চলতে দন্তের শক্তি পরীক্ষা করতে লাগলাম—বাদামগুলি দাঁতের চাপে ভেঙ্গে। ৯ মাইল পরে মারগালা পাশ—সেখানে জন নিকল্‌সনের মনুমেণ্ট স্থাপিত আছে।

মনুমেণ্টের কাছেই পথের পাশে পথিকদের জন্যে বিশ্রামের একটী গুহা—সেখানে একটী জলের ঝরণাও আছে। গুহাতে কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম করলাম।

মারগালাপাশ থেকে সরাইকালা ১১ মাইল। সরাইকালা থেকে একটী শাখা পথ দিয়ে তক্ষশিলা মিউজিয়ামে উপস্থিত হ'লাম। মিউজিয়ামের কিউরেটর হচ্ছেন একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক—নাম তাঁর মণি গুপ্ত।

মিউজিয়াম দেখার জন্যে অনুমতি পত্র নিতে হ'লো। বৌদ্ধমূর্ত্তি, শিলালিপি, নানাপ্রকার মাটির আসবাবপত্র, কাঁচের জিনিষ, সোণারুপার অলঙ্কার ইত্যাদি দেখলাম। দেখবার সঙ্গে সঙ্গে মণিবাবু সব বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছিলেন—তাঁর কথাগুলি যতই শুনছিলাম ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। প্রত্নতত্ত্বের জঞ্জালের মধ্যে যে এত বিস্ময় ও আনন্দ লুকান আছে আগে তা জানতাম না।

মণিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে চিরটোপে (ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ)

গেলাম। সেখানে অনেকগুলি বৌদ্ধস্তূপ, মন্দির এবং সন্ন্যাসীদের ছোট ছোট ঘর দেখ্‌লাম। সর্ব্বাপেক্ষা বড় স্তূপটী মাঝখানে বর্ত্তমান—প্রায় ২০০০ বছরের ওপর হ'বে এই স্তূপটী নির্ম্মিত হয়েছিল। এর আশে পাশে আরও অনেকগুলি ছোট স্তূপ ছিল, কালক্রমে সেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে।

কূনাল স্তূপ। অশোকের পুত্রের নাম ছিল কূনাল। বিমাতার চক্রান্তে তাকে অন্ধ করা হয়। অশোক কূনালের ওপর বিমাতার এই নিষ্ঠুর আচরণ স্মরণ রাখবার জন্যে কূনাল স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। কূনাল স্তূপ ভাল করে দেখবার মত সময় পেলাম না। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছিল তাই ফিরতে হ'লো। আর কিছু দেখা হ'লো না, বড় আক্ষেপ রয়ে গেল।

মণিবাবুর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গেলাম। তিনি সরাইকালা পল্লীতে থাকেন। তাঁর বাড়ীর দরজার গোড়ায় অনেকগুলি লোক জমায়েৎ হয়েছে দেখলাম। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলাম তারা মণিবাবুর কাছে ওষুধ নিতে এসেছে।

নিজে একজন চিত্রকর হলেও, সরাইকালাতে তাঁকে অনেকে ডাক্তার বলেই জানে। ছোটখাট রোগের জন্যে তিনি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বিলি করে থাকেন। সরাইকালার লোকগুলিও মণিবাবুকে খুব মানে।

মণিবাবু এখানে সপরিবারে থাকেন। খোকা (মণিবাবুর

ছেলে) চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে "অচল" "অধম" পড়ছিলো। আমাকে দেখে বই বন্ধ করে কাগজ পেন্সিল নিয়ে রেখাপাতে বিচিত্র ছবি এঁকে আমাকে দেখাতে লাগলো। এমন সময় মণিবাবু তাকে দু'ধমক লাগাতেই সে আবার বইয়ের পাতা খুলে "অচল" "অধম" স্বরু করলে। কিন্তু এবার "অচল" উচ্চারণ করতে তার চোখ ছল ছল সজল হয়ে উঠলো—মন আর পড়ার দিকে একটুও এগোতে চায় না। সে একদম অচল হয়ে পড়ল অগত্যা তাকে ছুটী দিতে হ'লো। খোকার তখন আনন্দ আর দেখে কে, আবার কাগজের ওপর পেন্সিল চালিয়ে রকমারি রকমারি ছবি আঁকৃতে আরম্ভ করলে।

২২.৩.২৪

তক্ষশিলা থেকে ১০ মাইল পরে হাসানাবদাল। হাসানাবদালের আর এক নাম পাঞ্জাসাহেব।

গুরু নানক একদিন শিষ্যসহ হাসানাবদালে উপস্থিত হ'লেন। তিনি মর্দ্দানাকে (গুরু নানকের শিষ্য) ফকির বাবাওয়ালীর জলাশয় থেকে জল আনৃতে পাঠালেন। বাবাওয়ালী মর্দ্দানাকে জল তো নিতে দিলেই না তার ওপর তাকে খুব করে ব'কে দিলেন। মর্দ্দানা গিয়ে গুরু নানকের কাছে ব্যাপারখানা বল্‌লে। নানকদেব তৎক্ষণাৎ একটী গর্ত্ত খুঁড়লেন, দেখ্‌তে দেখ্‌তে গর্ত্তটী সুমিষ্ট জলে ভরে গেল, আর ওদিকে বাবাওয়ালীর

জলাশয়ের জল শুকিয়ে এলো। বাবাওয়ালী তখন রেগে অস্থির—একখানি বড় পাথর তুলে নানকদেবের দিকে ছুড়ে মারলেন। গুরু নানক ডান হাতের পাঞ্জা দিয়ে ঐ পাথরটার গতিরোধ করলেন। পাথরটার ওপর তাঁর হাতের পাঞ্জার দাগ পড়ে গেল। এখনও পর্য্যন্ত এই পাথরটা আছে—শিখরা ভক্তি ভরে এর পূজা করে। এই ঘটনার পর হাসানাবদালের অপর একটী নাম হলো পাঞ্জাসাহেব।

৩৪ মাইলে (রাওয়ালপিণ্ডি থেকে) হারো নদী রেলপুলের ওপর দিয়ে পার হয়ে লরেন্সপুরে (৪০) এলাম। লরেন্সপুরে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে ক্যাম্বেলপুরের দিকে রওনা হ'লাম, রেলপথ ধরে—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে অনেকটা পথ বেশী পড়ে যায়।

ক্যাম্বেলপুরে ৬টার সময় পৌছলাম। সারাদিনে চলা হ'লো মোট ২৮ মাইল। শ্রীযুক্তপ্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয় ক্যাম্বেলপুর ছাউনীতে থাকেন—তিনি আমাকে যথেষ্ট সমাদর দেখালেন।

তখন বোধহয় সন্ধ্যা ৭½টা বাজে। প্রভাতবাবুর বাসা ঠিক ক্যানটন্‌মেণ্ট বাজারের কোণ ঘেঁসে। আমি বাইরের ঘরে বসেছিলাম। হঠাৎ এমন সময়ে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো—সঙ্গে সঙ্গে দু'চারটা বন্দুকের আওয়াজ শোনাও গেল। প্রভাতবাবু তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বাইরের ঘরের দরজাতে বেশ

করে হুড়কো লাগিয়ে—বাত্তিটী নিভিয়ে দিয়ে, আমাকে টেনে নিয়ে বাড়ীর ছাদের উপর তুল্লেন।

ছাদের ওপর উঠে দেখি দোকান-পাট সব বন্ধ ক'রে সবাই —দে লম্বা ছুট! দোকানের আলো সব নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। ব্যাপার্ কি?

প্রভাতবাবু বল্লেন "এটা হচ্ছে alarm signal, হয়তো কোনও ডাকাতের দলের আসবার সংবাদ পেয়েছে তাই এরকম সব শব্দ করা হয়েছে।"

এরপর আর কোনও গোলযোগ শুন্তে পাইনি। সারারাত নিতান্ত চিন্তিত না হ'লেও একেবারে নিশ্চিন্ত হইনি। প্রভাতবাবু ডাকাতের সম্বন্ধে কত ভয়ানক ভয়ানক গল্প বল্তে লাগ্লেন—সে সব শুনে চিন্তার মাত্রাটা বরঞ্চ আরও বেড়ে গিয়েছিল।

২৩, ৩, ২৪

ভোজনের আড়ম্বরে বেলা ১২টা বেজে গেল। ক্যাম্বেলপুর থেকে আটক ১৩ মাইল দূর। রেল লাইন ধরে চল্লাম। দু'ধারে উঁচু পাহাড়। কিছুদূর চলতেই একজন মুসলমান সঙ্গী পেলাম, তার বয়স আন্দাজ ৪০।৪৫ হবে। সে ক্যাম্বেলপুরে এসেছিল থান কাপড় কিন্বার জন্যে, এখন সে বাড়ী ফিরছে।

দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে রেল লাইনের ওপর দিয়ে চল্তে

লাগলাম। তাঁর সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হ'লো। কথায় কথায় সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আমি আকবর খাঁনকে চিনি কি না —আকবর খাঁন তার ভাই—সে কল্‌কাতায় বড়বাজারে ফলের দোকান করে।

আমি বল্‌লাম (যদিও আকবর খাঁনকে কোনদিনও জানি না) "হ্যাঁ তাকে খুব চিনি—সে কল্‌কাতায় আনার আঙুর কিস্‌মিস বেদানা বিক্রী করে—বড় রাস্তার পাশে তার দোকান, নয় কি ?"

সে খুব খুসী হয়ে উত্তর করলে "হুঁ"।

আমি আবার বল্‌লাম "আকবর খান মাথায় পাগড়ী আর পায়ে জুতো পরে—চোখে সুরমা দেয় আর মাঝে মাঝে বাঙ্গালা পান খায় তাই নয় কি ?"

সে তখন ভারি খুশী—আমার মুখে তার ভাইয়ের কথা শুনে।

আহ্লাদের চোটে সে আমাকে বল্‌লে—"তুমি আমার বাড়ী চল, তোমার সম্মানের জন্য একটা 'বারহা' কাটা হবে।" আমি হ্যাঁ না কিছুই বল্‌লাম না। এম্নি করে দু'জনে কথাবার্ত্তা কইতে কইতে আটকে এলাম—বেলা ৩টার সময়।

সে আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে খুব চেষ্টা করলে, আমি কিছুতেই যেতে রাজি হ'লাম না। কি জানি

শেষকালে যদি কোনও বিড়ম্বনা ঘটে। আমি হিন্দু—সে হচ্ছে পাঠান মুসলমান—কাজেই এরকম আশঙ্কা সহজেই করা যেতে পারে।

আটক বস্তিতে গেলাম। সেখান থেকে ১½ মাইল পথ এগিয়ে সিন্ধু এবং কাবুল নদের মিলন স্থলে উপনীত হ'লাম। একখণ্ড ছোট পাথরের ওপর বসে সে জলধারার কল্লোলগীতি একমনে শুন্‌তে লাগ্‌লাম—চারিদিকের দৃশ্য অতীব মনোরম, প্রকৃতিদেবী যেন তার সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার এখানে উন্মুক্ত করে রেখেছেন।

কিছু দূরে দেখতে পেলাম, কয়েকটী পাঠান-বালা কলসী ভরে নদীর জল নিয়ে গেল। তাদের দেখে মনে পড়ে গেল—পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত—শান্তির নীড় ছোট গ্রামখানি। ছায়া-ঢাকা পল্লীপথ—সে পথ দিয়ে গাঁয়ের বধূরা পদ্মার ঘাটে জল আনতে যেতো, কারও বা হয় তো জল ভরতে গিয়ে কলসী ভেঙ্গে গেল—

ওগো

"বধূর ঘাটে কলসী ভাঙ্গন
মৌনী হেসে খুন
মাঝে মাঝে কাঁকনখানি
বাজছে ঠুম্বক ঠুন।"

১৮০/১৫৬

পদব্রজে পেশোয়ার যাত্রী

কত কথাই না মনে পড়তে লাগ্‌লো। শীকর সিক্ত সমীর করুণ শীতল স্পর্শে পথিকের শ্রম দূর ক'রে নিলে।

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ক্রমে ঘনিয়ে কালো হয়ে এলো। আস্তে আস্তে আটকে ফিরে এলাম। আটক দুর্গ-প্রাচীরের কাছ দিয়ে চুপে চুপে যাচ্ছিলাম—কেন না এ যায়গায় খুব কড়া পাহারা। আটক দুর্গটী সমুন্নত পাহাড়ের ওপর স্থাপিত। কথিত আছে, এটা নাকি যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়েছিল। এখন এখানে ইংরাজ সেনারা থাকে। কোনও কারণ বশতঃ সহরে থাকলাম না। আটক ষ্টেশনে এলাম—ষ্টেশনমাষ্টার ওয়েটিংরুমে থাকবার অনুমতি দিলেন। রাত্রে সামান্য কিছু খাওয়া গেল, বিশেষ খাবার দরকারও ছিল না।

২৪.৩.২৪

সূর্য্য উঠবার সঙ্গে সঙ্গে Iron Girder Bridgeএর ফটক খুলে গেল।

ঝেলামের মত এখানেও মিলিটারি পাহারার বন্দোবস্ত। দু'টী ফটকের দু'মাথায় রাইফেল নিয়ে পাহারা দেওয়া হয়। ব্রিজের ফটক সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত খোলা থাকে। আমি বিনা বিঘ্নে পার হয়ে গেলাম।

মাইল তিনেক পরে খাইরাবাদে এলাম। এখান থেকে রাস্তাটী কিছুদূর পর্য্যন্ত কাবুল নদীর ধার দিয়ে চললো। রাস্তার

দু'পাশে ঝাউগাছের সারি—সুন্দর বিথীকা, এমনটী আর কোথাও দেখেছি ব'লে মনে হয় না।

বেলা ১১টায় আকোড়াতে এলাম। বড় ক্ষিদে পেয়েছিলো, অবেলায় একজন পাঠান ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়ে রুটি ঘোল খেয়ে নিলাম। আধখানি রুটিতে পেট ভরে গেল। আমাদের দেশের রুটি আঙুল দিয়ে ছিঁড়তে হয়, আর এদেশের রুটি হাত দিয়ে ভাঙ্গতে হয় এই যা প্রভেদ!

বিকেলবেলায় নওসেরাতে পৌছলাম। আটক থেকে নওসেরাতে আস্‌তে ২০ মাইল পথ অতিক্রম কর্‌তে হ'লো।

নওসেরা ছাউনী খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একবার (১৯০৮ সালে) নাওসেরা ছাউনীর ম্যাজিষ্ট্রেট একটা লোককে নেড়া করে গাধায় চাপিয়ে সমস্ত সহর ঘুরিয়েছিল—যেহেতু সে তার ঘরের সামনে কতকগুলি আবর্জ্জনা রেখেছিলো। নওসেরা ছাউনীটীকে পরিস্কার পরিপাটী রাখবার জন্যে এরকম কাণ্ড হয়ে গেছে। এখান থেকে রিসালপুরে গিয়েছিলাম—সেখানে কাবুল নদীর বক্ষে একটু নৌকা বিহার করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

নওসেরাতে বাঙ্গালীর গন্ধ পেলাম। ঘণ্টা দু'ই ঘুরে ফিরে তাঁদের কাছে উপস্থিত হ'লাম। তাঁরা খুব আদর যত্ন কর্‌লেন।

২৫, ৩, ২৪ তারিখটা নওসেরাতেই কেটে গেল।

২৬, ৩, ২৪

আজ পেশোয়ার যাবো, দূরত্ব ২৭ মাইল। রাস্তায় খুব এক চোট ধুলোর ঝড় পেলাম—তারই পর আবার ঝির ঝির বৃষ্টি পড়তে লাগ্‌লো। বৃষ্টিতে পথটা কাদা কাদা হয়ে গেল। কম্বলখানাকে নওসেরাতে বিদায় দিয়েছিলাম—যদি সেটা সঙ্গে থাক্‌তো তবে এখন মাথায় জড়িয়ে নিতাম।

সন্ধ্যে পাঁচটার সময় পেশোয়ার সিটিতে পৌঁছলাম। মোট সময় লাগ্‌লো তিন মাস চব্বিশ দিন—তার মধ্যে বিশ্রাম নিয়েছিলাম ৩৩ দিন। মোট ১৭২১ মাইল পথ চলা হ'লো।

আনন্দে মন প্রাণ ভরে গেল, সহরের এধার ওধার ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগ্‌লাম। কাকে বলি আমার আনন্দের কথা? আমার সঙ্গে যদি একজন সঙ্গী থাক্‌তো!

শেষ